কলিযুগের ধর্ম হরিনাম সংকীর্তন

ব্রহ্মা

শিব

নারদ

সনৎকুমার

মনু

কপিল

যম

মহাজন উপদেশ

প্রহ্লাদ

বলি

জনক

ভীষ্ম

শুকদেব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহাজন উপদেশ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের

অনুকম্পিত

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের

শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীসনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

কর্তৃক সংকলিত

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

Mahajana Upadesh (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীঝুলনযাত্রা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, ৫০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

সূচীপত্র

ভূমিকা

ব্যক্তি মন যদি পবিত্র সুন্দর হয়, তা হলে এভাবে সমগ্র মানব সমাজ পবিত্র ও সুন্দর হয়ে ওঠে। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক যে সমস্ত সমস্যার আমরা সম্মুখীন হচ্ছি তার সমস্ত সমাধান করা সম্ভব হয়, যদি আমরা আমাদের পূর্বতন মহাজনদের উপদেশ-নির্দেশ মতো আচরণ করি। বিশেষত কলিযুগের কলি-প্রভাবিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মহাজনদের নির্দেশগুলি আমরা পাই না বললেই চলে। হয়তো কোনও কোনও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি আমাদের পূর্বপুরুষ মহাত্মাগণের হিতোপদেশ প্রচার করবেন এবং আদর্শ মানব চরিত্রের বিকাশ সাধনের জন্য যত্ন করবেন। সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত নির্ধারিত দ্বাদশ মহাজনের হিতোপদেশ সম্বলিত এই অপূর্বসুন্দর "মহাজন উপদেশ" সমাদরণীয় হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

মহাজন কথা

আমরা শুনে থাকি নানা মুনির নানা মত। আমরা প্রায়ই বিভ্রান্ত হয়ে থাকি এই ভেবে যে, কোন্ মহাত্মার নির্দেশে আমরা জীবনপথে এগিয়ে যাবো, কোন্ মহাত্মার পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করবো, বা কোন্ মহাত্মার অভিমত আমরা গ্রহণ করবো?

এই বিষয়ে আমরা বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসন্ধান করতে পারি। আমাদের মনুষ্য প্রজন্মের কল্যাণার্থে মহর্ষি ব্যাসদেব সমস্ত বেদশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। নানা মুনি নানা মত-পথ নির্দেশ করলেও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যখন যক্ষ প্রশ্ন করলেন, কোন্টা প্রকৃত পথ? কঃ পন্থাঃ?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

মহাজনরা যে পথে গমন করেন, সেটিই প্রকৃত পথ। অর্থাৎ মহাজনদের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে যেই পথ। (মহাভারত বনপর্ব)

শ্রীমদ্ভাগবতে মহর্ষি ব্যাসদেব উল্লেখ করলেন, এই মহাজন কারা? যখন যমদূতেরা অজামিলকে যমদুয়ারে নেওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন তখন বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের সবিক্রমে বাধা দিয়েছিলেন। অগত্যা যমদূতেরা তাদের প্রভু যমরাজের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, হে মহারাজ, পাপী অজামিলকে ধর্মতঃ পাশবদ্ধ করতে গিয়ে আমরা বিপন্ন হয়েছি, চতুর্ভুজ অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা আমাদের ধর্মতত্ত্বজ্ঞানহীন বলে নির্দেশ দিয়ে বিতাড়িত করল, আপনি দয়া করে বলুন, কে প্রকৃত ধর্মতত্ত্ববেত্তা এবং ব্রহ্মাণ্ডের কত জন নিয়ন্তা?

শ্রীযমরাজ উত্তর দিলেন, ধর্মের বিচার অতি সূক্ষ্ম, সবাই বুঝতে পারে না। ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব বারোজন ব্যক্তি জানেন—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভু কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

অর্থাৎ, "ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, শিব, সনৎকুমার, দেবহুতিপুত্র কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনক রাজা, গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেব, বলি মহারাজ, ব্যাসপুত্র শুকদেব এবং আমি যম।"

যমরাজ আরও বললেন—

দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

"হে দূতগণ, এই দ্বাদশ মহাজন প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জানেন। প্রকৃত ধর্ম ভাগবত-ধর্ম বা ভগবৎ-প্রেম ধর্ম নামে পরিচিত। তা অত্যন্ত গোপন তত্ত্ব যা সাধারণ মানুষের দুর্বোধ্য। কিন্তু কেউ যদি ভাগ্যক্রমে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তবে সে সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করবে।" (ভাগবত ৬/৩/২০-২১)

মহাজন বা মহাত্মা কাকে বলে? এবং তাঁদের মুখ্য কর্ম কি? এই প্রসঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে অর্জুন, মহাত্মাগণ সর্বদা আমার দিব্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করে থাকেন। তাঁরা আমাকে সমস্ত জীবের আদি ও অব্যয় জেনে অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করেন।"

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

"দৃঢ় ব্রত ও যত্নশীল হয়ে, সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে, এই সমস্ত মহাত্মারা নিরন্তর ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে থাকেন।" (ভগবদ্গীতা ৯/১৩-১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখিত দ্বাদশ মহাজনের কথা আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। তাঁরা আমাদের জন্য কি পন্থা নির্দেশ করেছেন? কোন্ শিক্ষাদর্শে আমরা জীবন অতিবাহিত করব, এ সম্বন্ধে তাঁদের নির্দেশ কি? কি করে এই মহাজনেরা জড় ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করেও জড়াপ্রকৃতিতে প্রভাবিত হন না। তাঁদের চরিত্রকথাও আমরা আলোচনা করতে পারি।

আমাদের শুধু স্মরণ রাখতে হবে এই মহাজনেরা পরম গোপনীয় ধর্মতত্ত্ব জানেন, যে তত্ত্ব আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আমাদের জীবন পরমানন্দময় হয়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত-ধর্মকে সব চাইতে গোপনীয় ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, যেহেতু তুমি আমার প্রিয় সখা, তাই আমি তোমাকে এই পরম গোপনীয় ধর্মতত্ত্ব বলছি। তা হল **সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**—"অন্য সমস্ত কর্তব্য এবং ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" কেউ প্রশ্ন করতে পারে, এই তত্ত্ব যদি এতই দুর্বোধ্য হয়, তা হলে তার প্রয়োজন কি? তার উত্তর হল এই যে, মহাজনদের পরম্পরা ধারা অনুসরণ করে চললে প্রকৃত ধর্ম বোধগম্য হবে। জগতে চারটি প্রামাণিক পরম্পরা ধারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকার করেছেন। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে পরম্পরা ধারায় আশ্রিত না হলে, সেক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণ, মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ—সবই নিষ্ফল হয়। মানুষ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। তখন মানুষ তার প্রকৃত ধর্ম কি, তা কখনও বুঝতে পারবে না।

দ্বাদশ মহাজন প্রণাম

নমো সাধুভ্যঃ মহাজনেভ্যো
হিতাকাঙ্ক্ষীভ্যো সর্বলোকানাম্ ।
নমো বিধাত্রে নারদায় চ
নমো শিবায় কুমারেভ্যশ্চ ॥
নমো মনবে কপিলায় চ
প্রহ্লাদায় চ জনকায় চ ।
নমো ভীষ্মায় কৃতান্তায় চ
বলিনে চ শুকদেবায় চ ॥

সর্বলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীশিব, চতুষ্কুমার, বৈবস্বত মনু, দেবহূতি পুত্র কপিল, প্রহ্লাদ, রাজর্ষি জনক, গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, শ্রীযমরাজ, দৈত্যরাজ বলী ও শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রমুখ সত্যশীল মহাজনদের পাদপদ্মে আমি বারংবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীব্রহ্মা

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম। শ্বেতবরাহ কল্পে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাই সৃষ্টির আদি জীব। পদ্ম-উপরি উপবিষ্ট ব্রহ্মার চারটি মস্তক। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা রয়েছেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, বিশমাথা, পঞ্চাশমাথা, শতমাথা, সহস্রমাথা, লক্ষ মাথা ব্রহ্মা রয়েছেন। ব্রহ্মাণ্ড সমূহও ছোট বড় আকৃতির। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডটি সবচেয়ে ছোট। আমাদের ব্রহ্মার চারটি মস্তক।

সৃষ্টির সমস্ত জীব থেকে ব্রহ্মা বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধও। প্রথমে তিনি চিন্তা করলেন, "আমি কোথা থেকে এলাম। কেউ তো কোথাও নেই, কেবল আমি একা।" ভাবলেন এই পদ্মের নাল বেয়ে নিচে নামবেন কিনা। শেষ পর্যন্ত তিনি ধ্যানস্থ হয়ে তাঁর সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে সন্ধিৎসু হলেন।

বহু বর্ষ পরে ভগবান শ্রীহরি দর্শন দান করলেন। ভগবান বললেন, হে ব্রহ্মা, এই দেখো চৌদ্দ ভুবন। সমস্ত ভুবন জীবে পরিপূর্ণ করো।

ভগবান ব্রহ্মার মধ্যে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন। ব্রহ্মা ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। সৃষ্টিকার্যে তিনি নিয়োজিত। ব্রহ্মা নিজ অঙ্গ থেকে মুনি ঋষি এবং মরীচি প্রমুখ প্রজাপতির সৃষ্টি করলেন। তিনি তাঁদের কাউকে তপস্যা আচরণে নির্দেশ দিলেন, কাউকে বা সাংসারিক কর্মে নিয়োজিত করলেন।

তারপর ব্রহ্মা চিন্তা করলেন আর নিজের থেকে এভাবে সৃষ্টি না করে, নারী-পুরুষের মাধ্যমে সংসার সৃষ্টি হোক। তাঁর সংকল্প অনুসারে মানস পুত্ররূপে মনুকে এবং মনুর অর্ধাঙ্গিনীরূপে শতরূপাকে সৃষ্টি করলেন। তাঁরা মিলিত হয়ে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকুতি, প্রসূতি ও দেবহূতি নামে তিন কন্যার জন্ম দেন। তাঁদেরকে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর হাতে সমর্পণ করা হয়। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মার দ্বারাই সৃষ্টিকার্য ব্যাপকভাবে পরিচালিত হতে লাগল।

সৃষ্টি করবার জন্যে ভগবান ব্রহ্মাকে রজোগুণ দিয়েছিলেন। রজোগুণের মধ্যে রয়েছে সংকল্প, আগ্রহ ও প্রচেষ্টা। চতুর্মুখ ব্রহ্মা রজোগুণপ্রভাবে

গঙ্গাজল যেমন মদের ভাণ্ডকে পবিত্র করতে পারে না, সেরকম বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ, উপবাস, তপস্যা, ব্রত, দান, শুভকর্ম—এ সবই অভক্ত ব্যক্তিকে পবিত্র করতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তি-পরায়ণ নয়, সেই ব্যক্তি যদি তীর্থে স্নান করতে যায় তবে তীর্থ বিচলিত হন। বসুন্ধরা অভক্তের ভারে দুঃখে কম্পিত হয়ে থাকেন।

হে বৎস, শ্রীকৃষ্ণের কথাই বেদশাস্ত্রের সারবস্তু। যে মহাত্মা স্বপ্নে ও জাগরণে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কবেন, তিনি নিষ্পাপ হয়ে জগৎকে পবিত্র করেন, ভগবানের সুদর্শন চক্র সেই হাত্মাকে সুরক্ষিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর স্মরণকারী ভক্ত অপেক্ষা আত্মা, প্রাণ, দেহ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, আমি, শিব তাঁর কাছে কিছুই প্রিয় নয়। পরমপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভক্তগত প্রাণ এবং ভক্তগণ হচ্ছেন কৃষ্ণগত প্রাণ। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করেন, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ধ্যান করেন।

হে নারদ, যারা শ্রীকৃষ্ণসেবা-পরায়ণ নয়, তাদের জ্ঞান, তাদের তপস্যা, তাদের ব্রত, তাদের নিয়ম, তাদের তীর্থ স্নান, তাদের পুণ্যকর্ম সমস্তই নিষ্ফল। যারা ব্রাহ্মণ, অথচ কৃষ্ণভক্ত নয়, তারা ধর্মভ্রষ্ট পতিত জীব। কৃষ্ণভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্বধর্মাচারশীল চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ এমনকি কুকুর-শূকরেরাও ভালো। হে নারদ, ধর্মহীন ব্রাহ্মণেরা যা আহার্যরূপে গ্রহণ করা উচিত নয়, সেইগুলিও তারা ভক্ষণ করে। প্রতিদিন বিপরীত ধর্মাচার দ্বারা তারা পতিত হয়ে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হয়।

নারদমুনি প্রশ্ন করলেন, হে পিতা, ব্রাহ্মণদের স্বধর্ম কি? তাঁদের ভক্ষ্য বস্তু কি?

ব্রহ্মা বললেন, হে পুত্র, ব্রাহ্মণদের নিরন্তর কৃষ্ণসেবন করাই স্বধর্ম। এই জন্যই অন্যান্য লোকেরা ব্রাহ্মণকে সশ্রদ্ধ সম্মান জ্ঞাপন করে থাকে, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ও পদধৌত জল পান করে থাকে। ব্রাহ্মণরা প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদই তাঁদের আহার্য বস্তু।

নারদমুনি প্রশ্ন করলেন, হে পিতা, ব্রাহ্মণরা যদি প্রত্যহ কৃষ্ণপ্রসাদ না গ্রহণ করে অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করে, তবে দোষ কি?

ব্রহ্মা বললেন, পণ্ডিতেরা সেই খাদ্যকে অখাদ্য বলে বর্ণনা করেন। সেই অন্ন বিষ্ঠা সম, সেই পানীয় মূত্র সম হয়। কোল ভীল ম্লেচ্ছ চণ্ডালেরা ভগবানকে অনিবেদিত অন্ন, রক্তমাংস জাতীয় অমেধ্য বস্তু ভক্ষণ করে থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি সেই বস্তু ভক্ষণ করে তবে চণ্ডালাধম বলে গণ্য হয়।

হে নারদ, এখন আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিতে ইচ্ছা করছি, তা হল এই, কৃষ্ণভক্ত শিবকে গুরুরূপে গ্রহণ করে অচিরেই কৃষ্ণদাস্য ভক্তি লাভ কর। তোমার এরকম নির্জনে বসে তপস্যা করার দরকার নেই। শ্রীকৃষ্ণভক্তিই দুঃখময় সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার নৌকা স্বরূপ। গুরুদেব সেখানে কর্ণধার স্বরূপ। হে নারদ, তুমি যে-দৈববাণী শুনেছিলে, দেবী সরস্বতীই তোমার উদ্দেশ্যে এই কথা বলে প্রস্থান করেছেন।

শ্রীব্রহ্মা যখন নারদকে এই সমস্ত কথা বলছিলেন, তখন ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার বললেন, হে পিতা, আমি কোনও কথা বুঝতে পারিনি, দয়া করে আমাকে পুনরায় বলুন। শ্রীকৃষ্ণকে যে আরাধনা করেছে তার আর তপস্যা করা অনর্থক এবং যে শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করেনি তারও তপস্যা ব্যর্থ হয়, যদি এই দুই জনই তপস্যারহিত হয়, তবে তপস্যার স্থান কি ধরনের লোকের প্রতি নির্দিষ্ট থাকল?

ব্রহ্মা বললেন, হে বুদ্ধিমান্, তোমাকে পুত্ররূপে পেয়ে আমার জীবন ধন্য। 'আরাধিত' কথাটিতে আ অর্থ বিশেষরূপে 'রাধিত' শব্দটি প্রাপ্তবাচক হয়। অতএব যিনি শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর তপস্যার প্রয়োজন নেই। কোনও মূঢ় ব্যক্তি, যখন শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ, তার তীর্থ, দান, তপস্যা, পুণ্য, ব্রত তাকে পবিত্র করতে পারে না।

সনৎকুমার জানতে চাইলেন, হে পিতা, কোন্ ধরনের ব্যক্তি তপস্যা করবে?

ব্রহ্মা বললেন, যে ব্যক্তি মূঢ়তম, কিংবা, যে ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট ভক্তিলাভ করেছে, এই উভয় ব্যক্তিই সুখী। তাদের তপস্যা করার দরকার নেই। কিন্তু মধ্যম লোকেরাই তপস্যা করবার অধিকারী বা উপযুক্ত হয়ে থাকে। মধ্যম ব্যক্তিরা যারা গৃহস্থ সাধক, সংসারে ব্যাপৃত থেকে পূর্ব কর্মের ফলভোগে অনুরাগী হয়ে অভীপ্সিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম পাওয়ার বাসনায় তারা তপস্যা করে।

সনৎকুমার প্রশ্ন করলেন, হে পিতা, তারা কিরকম তপস্যা করবে?

ব্রহ্মা বললেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ-কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত ও মহাপ্রসাদ সেবন করাই সকলের বাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

—হে পিতা, অধিকাংশ লোকেরই তা হলে শ্রীকৃষ্ণভক্তিমূলক তপস্যার প্রয়োজন আছে। তবুও আমার জানতে ইচ্ছা হয় যে, সংসারের সব লোক কৃষ্ণভজন করে না কেন?

—হে বৎস, যার বুদ্ধি পূর্বজন্মকৃত কর্মদোষে মন্দ হয়েছে এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছে, তারা তমোগুণের অধীন হয়ে থাকে। তার ফলে তারা ত্রিগুণের অতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না, এমনকি জানতেও আগ্রহ থাকে না। সংসারের সেই সব লোক তাই কৃষ্ণভজন করবে না।

—হে পিতা, তা হলে সংসারের সেই সব কৃষ্ণবিমুখ লোকদের কিভাবে সদ্‌গতি হবে?

—হে পুত্র, অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে, সাধুসঙ্গক্রমে কিংবা সৌভাগ্যক্রমে কেউ যদি অপ্রসাদভোজী না হয়ে কৃষ্ণপ্রসাদভোজী হয়, তা হলে, তার হৃদয়ে সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে, সে দেহত্যাগের পর দিব্যরথে করে গোলোক কিংবা উৎকৃষ্ট কোনও গ্রহলোকে স্বেচ্ছামতো গমন করতে সমর্থ হবে।

শ্রীশিব

একসময়, স্বর্গের মন্দাকিনীর তীরে শ্রীনারদমুনি মহাদেবের কাছে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র লাভ করলেন। তারপর নারদ ও মহাদেব শিব এক স্থানে এসে পৌঁছলেন যেখানে পার্বতীদেবী, কার্তিক ও গণেশ বসেছিলেন। সেখানে মহাকাল, নন্দী, বীরভদ্র, সিদ্ধ মহর্ষিগণ ও সনকাদি মুনিগণ এসে বসলেন। বাক্যালাপে প্রসঙ্গ ক্রমে নারদমুনি মহাদেবকে বললেন, হে ভগবান, যে জ্ঞান কর্মফলচক্রে আবদ্ধ করায় না, যে জ্ঞান সর্ববেদের সার, সেই বিষয়ে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে বলুন।

মহাদেব বললেন, হে নারদ, পঞ্চরাত্র নামে এক অনুপম জ্ঞান পূর্বে গোলোকে বিরজার তটে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে প্রদান করেছিলেন, তারপর নিরাময় ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মা আমাকে সেই জ্ঞান প্রদান করেন, সেই সর্ব-অভীষ্ট সর্বজ্ঞানপ্রদ পবিত্র জ্ঞান আমি তোমাকে দান করছি, পরে তুমি ব্যাসদেবকে প্রদান করবে। আর সেই ব্যাসদেব তার পুত্র শুকদেবকে দান করবে।

হে নারদ, এই জ্ঞান সবার আদি, সর্ববেদের সার, অতি মনোহর। জগৎ সংসারে যত মত আছে, যত মন্ত্র আছে, যত কর্ম আছে, যত কর্মচক্র আছে—সেই সমস্ত কিছুর সারাৎসার, সর্বকর্মচক্রের মুক্তির পন্থা হচ্ছে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবা। নিখিল মহাবিশ্বে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিত্য বিদ্যমান। আর অন্য সমস্ত কিছুই তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই উৎপন্ন হয়েছে। বিশ্বের সবাই তাঁরই মায়ায় মোহিত। এক কৃষ্ণ তাঁর অনন্ত রূপ, তাঁর অনন্ত গুণ, তাঁর অনন্ত কীর্তি এবং তাঁর অনন্ত জ্ঞান।

হে নারদ, তাঁর সৃষ্ট জড় বিচিত্র বিশ্বও অনন্ত। এই বিশ্বের সব জায়গা ক্ষুদ্র, বৃহৎ, মধ্যম শ্রেণীর নানা জাতীয় জীবে পরিপূর্ণ। সেই জীবগুলি কর্মশীল। কর্মের ফলস্বরূপ তারা সুখ-দুঃখ ভোগ করছে।

সর্বান্তরাত্মা ভগবান প্রত্যেক জীবের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান। জীবের বুদ্ধি আছে। সেই বুদ্ধিশক্তি নিদ্রা, তন্দ্রা, দয়া, শ্রদ্ধা, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, ক্ষুধা,

লজ্জা, তৃষ্ণা, ইচ্ছা, শান্তি, চিন্তা, জরা, জড়া প্রভৃতি নাম ধারণ করে। অনুচরেরা যেমন রাজার অনুগামী হয়, সেরকম এই সব শক্তি জীবের অনুগামী হয়ে থাকে। চিন্তা ও জরা সর্বদা জীবের শোভা ও পুষ্টির ব্যাঘাত করে। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে জীব যে স্থূল দেহ ধারণ করে কর্ম করছে সেই দেহটি পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ দিয়ে তৈরি। এই দেহ ধ্বংস হলে দেহটি পঞ্চভূতের মধ্যে মিশে যায়। প্রায় জীবই এই জগৎ সংসারে ভ্রান্তিবশে মায়ামোহিত হয়ে রোদন করতে থাকে। কিন্তু যারা সাধু ব্যক্তি, তাঁরা নিত্য সত্য অভয়প্রদ এবং জন্মমৃত্যুজরা-অপহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল সেবা করেন।

হে নারদ, এই বিশ্ব স্বপ্নের মতো অনিত্য। অতএব এতে বিমোহিত না হয়ে আনন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ভজনা করো। এই হচ্ছে প্রথম জ্ঞান।

এবার দ্বিতীয় জ্ঞানের কথা শ্রবণ করো। জ্ঞানী ব্যক্তিরা মুক্তি বাসনা করেন। সাধু পণ্ডিত ব্যক্তিদের পরমামুক্তি সততই বাঞ্ছিত। কিন্তু সমস্ত মুক্তি শ্রীকৃষ্ণভক্তির কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়। মুক্তি কৃষ্ণভক্তির ষোলোভাগের একভাগও আকর্ষণীয় নয়। কৃষ্ণভক্ত-সংসর্গের ফলে কারও হৃদয়ে ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত হয়।

মাঠের মাঝে বৃক্ষের বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় জল পেলে, তেমনই হৃদয় মধ্যে ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর প্রকাশিত হয় ভক্তসঙ্গ পেলে। ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপে ভক্তি জাগ্রত হয়। আবার রৌদ্র মধ্যে অঙ্কুর যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনই অভক্তজনের সঙ্গে সর্বদা সংলাপে ভক্তি শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সর্বদা ভক্তজনের সঙ্গে আলাপ করেন।

হে নারদ, সোনা যেমন নিকৃষ্ট ধাতুর সংযোগে মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তেমনই সৎ ব্যক্তিও সংসারের দুর্বুদ্ধি লোকের সংস্পর্শে মন্দ হয়ে যায়। এজন্য সর্বদা নিরন্তর ভক্তিপূর্বক শ্রীকৃষ্ণভজনে যুক্ত থাকাই কর্তব্য।

ভক্তিপূর্বক কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের কাছ থেকে তার কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করা উচিত। কখনও অভক্ত অবৈষ্ণবের কাছ থেকে নয়। সংসারে যারা কৃষ্ণনিন্দুক, কৃষ্ণবিমুখ, কৃষ্ণভক্ত নিন্দুক, তারা অশুচি ও পাপিষ্ঠ। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি শত পুরুষ সহ নিজেকে উদ্ধার করে।

হে নারদ, পূর্বে কৃষ্ণের আলয় গোলোকে বিরজাতীরে ক্ষীরের মতো অমল জলে আমি শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করেছি। নিত্য আমি কৃষ্ণমন্ত্র জপ করি। পার্বতী, কার্তিক, গণেশ সবসময়ই কৃষ্ণনাম কীর্তন করে থাকে।

হে নারদ, লোকে দুর্দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলে ও স্মরণ করে। মেঘে আচ্ছন্ন অন্ধকার দিনকে আমি দুর্দিন বলি না। যেই দিন কৃষ্ণকথা হয় না, আমি সেই দিনকে দুর্দিন বলে থাকি। লোকে কোনও কর্মে অসফল হলে দুঃখিত হয়, হাহুতাশ করে। কিন্তু হে নারদ, যেই দিন ক্ষণকালও অমৃততুল্য কৃষ্ণকথা হয় না, শ্রীকৃষ্ণের কীর্তনবিহীন সেই দিনটিকে নিষ্ফল বলে মানি এবং কাল সেদিনের অনর্থক আয়ু হরণ করে। কৃষ্ণকথাই আনন্দময়, কৃষ্ণকথাই মঙ্গলময়।

হে নারদ, সাপেরা গরুড়কে দেখলে যেমন পালিয়ে যায়, পাপরাশিও তেমনই কৃষ্ণকীর্তনকারীর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। পূর্বে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করেন। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উপবেশন করে সেই মন্ত্র তিনি শতলক্ষবার জপ করেন, তাতে সৃষ্টির কারণভূত নির্মল জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সেই মন্ত্র প্রভাবে তিনি অষ্টাদশ সিদ্ধি লাভ করেন, এবং বিবিধ সৃষ্টি করে বিধাতা নাম প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণমন্ত্র কোটিবার জপ করতে করতে অনন্তদেবের সহস্র মস্তক হয়।

হে নারদ, পূর্বে একসময় কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার গর্ভে এক স্বর্ণময় ডিম্ব উৎপন্ন হয়, গোলোকধাম থেকে আগত সেই ডিম্ব দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভেঙ্গে যায় এবং মহার্ণবে পতিত হয়। সেই ডিম্ব থেকে মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে মহাজলে শয়ন করলেন। মহাবিষ্ণুর লোমকূপ থেকে আলাদা আলাদা ভাবে পৃথক জলরাশি উদ্ভূত হয়ে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হল। সেগুলি সপ্ত

আবরণীযুক্ত এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মধ্যস্থানে ভূলোক। ভূলোকের ঊর্ধ্বদিকে যথাক্রমে ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, জনলোক, মহর্লোক, তপোলোক ও সত্যলোক। আর ভূলোকের নিম্নদিকে যথাক্রমে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাললোক রয়েছে। সত্যলোকের বামদিকে ধ্রুবলোক, পাতাললোকের ডানদিকে নরক লোক রয়েছে।

হে নারদ, মধ্যস্থানের ভূলোকে ভারতবর্ষ বিখ্যাত। ভারতবর্ষের মধ্যে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। ভারতবর্ষ যেরূপ মাহাত্ম্যপূর্ণ, অন্য স্থান ততটা নয়। বহু পুণ্যফলে কারও ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভের সৌভাগ্য হয়। মানুষদের মধ্যে তাঁরাই মহান বা বিদ্বান, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম ভজনা করেন। মানবজীবন পেয়েও জীব যদি শ্রীকৃষ্ণভজনা না করে, তবে তার চেয়ে আর বিড়ম্বনা কি? শ্রীকৃষ্ণভজনহীন তার জন্ম অনর্থক, তার গর্ভযাতনা বৃথা, তার অনিত্য শরীর নিষ্ফল, তার জীবন ব্যর্থ। সে জীবন্মৃত।

হে নারদ, এই ভারতে যে ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীহরির পাদোদক ও নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন, কৃষ্ণনাম মন্ত্র গ্রহণ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হন। তাঁর পদধূলিতে পৃথিবী পবিত্রা হন।

হে নারদ, এবার তৃতীয় জ্ঞানের কথা শ্রবণ করো। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের কথা কেউই বর্ণনা করতে সমর্থ নয়। যা তুমি শুনতে পাবে, সবই কিঞ্চিৎ কথা মাত্র। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা আর কেউই আদিপুরুষ নেই, আর কেউই পরম আরাধ্য নেই। তাঁর অপেক্ষা জ্ঞানী বা যোগীও কেউ নেই। তাঁর অপেক্ষা সবার পরিপালক জনকও আর কেউ নেই। তাঁর অপেক্ষা বলবান, কীর্তিমান, দয়ালু ও ভক্তবৎসল আর কেউ নেই। যে মায়াদেবী অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে মোহিত করেন, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে স্তব করতে অক্ষম এবং অতি ভীতা হন। বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে সমর্থ না হয়ে জড়প্রায় হয়ে যান।

হে নারদ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জীবের হিত বাসনায় গুরুরূপ ধারণ করে থাকেন কিংবা কাউকে তাঁর প্রতিনিধি করে প্রেরণ করেন। গুরুদেব তুষ্ট হলে স্বয়ং ভগবানও তুষ্ট হন। ভগবান তুষ্ট হলে ত্রিজগৎ তুষ্ট হয়। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহাদেব। হরি রুষ্ট হলে গুরুদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর অনুগামীকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হলে কেউই তাকে রক্ষা করতে সমর্থ নয়।

হে নারদ, যা থেকে কৃষ্ণভক্তি জন্মে তাকেই মন্ত্র বলা যায়। কৃষ্ণই বন্ধু, কৃষ্ণই পিতা। আর কৃষ্ণভক্তিই মৈত্রী ও জননী। গুরুদেব কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করান। হে নারদ, তুমি প্রকৃতির অতীত রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করো। জগতে যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণভক্তি অনুশীলন শিক্ষা না দিয়ে অন্য পথ প্রদর্শন করেন, তিনি কখনই গুরু নন। তাঁকে পারমার্থিক গুরুরূপে কখনই গ্রহণ করা উচিত নয়, অধিকন্তু তাঁকে মহা শত্রু বলে মনে করা কর্তব্য। কৃষ্ণভক্তি পন্থা অনুসরণহীন ব্যক্তি যিনি গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নিত্য আরাধিত হন, তিনি শিষ্যহত্যার ফল লাভ করেন। আর সেই তথাকথিত শিষ্যের জন্মও বিফল হয়।

এই আমি তোমাকে চতুর্থ জ্ঞানের কথা বললাম।

নারদ প্রশ্ন করলেন, হে ভগবন্‌, ভক্তরা কৃষ্ণভক্তি করে, যোগীরা জ্যোতির ধ্যান করে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি যথার্থ পথ?

শিব বললেন, যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হতে চায়, তারাই ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করে। তাঁরা ভগবানের শরীর বা আকার স্বীকার করে না। কেননা শরীর মানেই জড়, ব্রহ্ম মানেই চিন্ময়; দেহমাত্রই গুণে আসক্ত, অতএব নির্গুণ চিন্ময়ত্বের সম্ভাবনা নেই—এই জ্ঞানে তারা কেবল ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করে। কিন্তু সনৎকুমার প্রভৃতি আমাদের দ্বারা তা আদৌ সম্মত নয়। সমস্ত ব্রহ্মজ্যোতির উৎস হচ্ছেন সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তাই ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করেন না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিই নিরাকার বলা যায়। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান-আরাধনা করাই যথার্থ পন্থা।

শ্রীনারদ

শুকদেব গোস্বামী শ্রীনারদমুনিকে প্রণতি নিবেদন করলে দেবর্ষি নারদ প্রীত হয়ে বললেন, হে ধর্মপ্রাণ, এখন আমি তোমার কোন্ শ্রেয়স্কর কার্য সম্পাদন করব, তা বলো।

শুকদেব বললেন, হে দেবর্ষি, ইহলোকে যা হিতকর, আপনি আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

নারদ মুনি বললেন, বৎস, পূর্বকালে মহর্ষিগণ শ্রীসনৎকুমারের কাছে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে কারও সঙ্গে শত্রুতা আচরণ করা বিধেয় নয়। যাঁরা অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করেন, তাঁরাই অচিরে শ্রেয়ো লাভে সমর্থ হন। যাঁকে আশ্রয় করলে কি ইহলোকে, কি পরলোকে কোথাও শোক বা ভয়ের লেশমাত্র থাকে না, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করো। এই জড়জগতে যাদের লোভ নেই, তাদের শোকও নেই।

হে বৎস, এই জড়জগতে চতুর্দিকে দেখো, লোকদের বড় সুখ হচ্ছে দাম্পত্য সুখ। সমস্ত লোকেদের মধ্যে যিনি স্বয়ং একাকী অবস্থান করতে সমর্থ হন, তিনি জ্ঞানতৃপ্ত। তাঁকে কখনও শোকের অধীন হতে হয় না। ইন্দ্রিয়তর্পণকারী মানুষেরা জড় কর্মের বশীভূত হয়। এভাবে তারা শুভকার্য ফলে দেবত্ব লাভ করে, শুভ ও অশুভ মিশ্র ফলে মনুষ্যত্ব লাভ করে এবং অশুভ কার্য ফলে ইতর জন্ম লাভ করে। আসক্তি ও মোহবশত লোকে কোষকার পোকার মতো নিজ কর্মসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমস্ত মানুষকে দেখো, তারা কেমন জরা-মৃত্যুতে আক্রান্ত হয়ে এ জীবন পরিত্যাগ করছে এবং অন্য জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে স্থানান্তরিত হতেই হয়। অথচ মানুষ আসক্ত ও মোহগ্রস্ত হয়ে স্নেহ জালে বদ্ধ হয়ে লাভ করছে দুঃখকষ্ট। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, শরীর, সঞ্চিত ধন, সম্পত্তি—কিছুই পরলোকে তার সহগামী হয় না। কেবলমাত্র সহচর হয়ে থাকে পুণ্য ও পাপ। অর্থাৎ তোমার কর্মফল।

অতএব হে শুকদেব, মনুষ্য জীবনে দৈনন্দিন কর্মসমূহ এমনভাবে সম্পাদিত হওয়া কর্তব্য যাতে কর্মফলাবদ্ধ অনর্থ লাভ না হয়ে পরমার্থ লাভ হয়। লোকে যে কর্মফলে অনর্থ উৎপাদন করে, সেই অনর্থে জর্জরিত হয়ে সেই অনর্থ নিবৃত্তির জন্য অনেক অনর্থ কর্মের আমদানি করে। অল্পবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তি অনিষ্ট-সংযোগ এবং ইষ্ট-বিয়োগ হলে মানসিক দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে। তারা দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় না। অনেকে আছে যারা অতীত বিষয়ের চিন্তায় আসক্ত হয়, এমন ব্যক্তি কখনও জড় জাগতিক স্নেহপাশ থেকে উদ্ধার লাভে সমর্থ হয় না। যারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করে, তারা ধর্ম, যশ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে কষ্টেই কালযাপন করে। অনুতাপে অতীত বিষয় লাভ হয় না।

হে শুকদেব, সবার কর্তব্য হচ্ছে সত্যবাক্য প্রয়োগ করা। যে বাক্য দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গললাভ হয়, তাইই সত্য বাক্য। সেই নিত্য সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে আশ্রয় করলে কোনও কালে জীবের আর ভয় বা শোকের লেশমাত্রও থাকে না। সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করো।

প্রচেতাদের পিতা বর্হিষ্মান মহারাজকে দেবর্ষি নারদ কর্মফল সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় বলেন, জীব এই জীবনে স্থূল শরীরের মাধ্যমে কর্ম করে। স্থূল শরীর এবং মন-বুদ্ধি-অহংকার সমন্বিত সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা জীব কর্ম করছে। স্থূল শরীরের বিনাশ হয়ে গেলেও, সূক্ষ্ম শরীর থাকে এবং তা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। কেউ ভালো-মন্দ কর্ম করল। তার কর্মফল সঞ্চিত হল। তার মৃত্যু হল। অর্থাৎ তার স্থূল শরীর বিনাশ হল। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর—মন বুদ্ধি অহংকার বিনাশ হয় না। পরবর্তী স্থূল শরীরে সেই জীব সুখ বা দুঃখ ভোগ করবার জন্য আর একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করে। কৃষ্ণভক্তি চেতনায় স্থিত থাকলে, মন-বুদ্ধি-অহংকার জড় কলুষে কলুষিত হয় না। তখন স্থূলদেহ ত্যাগ করলে আর নতুন স্থূল দেহ না গ্রহণ করে চিন্ময় শরীর লাভ করা যায়।

জীব যদিও স্বরূপতঃ চিন্ময় থাকার কথা, কিন্তু জড় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে "আমি এই, আমি ঐ, এটা আমার কর্তব্য, তাই আমি এটি করব"—এরকম ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করে। এ সবই মনগড়া ধর্ম। এই সমস্ত কর্ম নিত্যস্থায়ী নয়। তা সত্ত্বেও ভগবানের কৃপায় জীব তার সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ করার সুযোগ পায়। এইভাবে সুযোগ লাভের জন্য সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়।

সূক্ষ্ম মানসিক আচরণ সমন্বিত জীব তার পূর্ব দেহ সম্বন্ধজনিত নানা প্রকার চিন্তা ও অনুভূতি অনুভব করে। হে রাজন্, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, পূর্ববর্তী শরীরে অভিজ্ঞতা ব্যতীত মনের দ্বারা কোন কিছুর কল্পনা করা সম্ভব নয়। প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে এই মন জীবের বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হওয়ার কারণ। মানুষের মানসিক অবস্থা থেকে বোঝা যায় সে পূর্ব-জন্মে কিরকম ছিল এবং ভবিষ্যতে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে। বর্তমান জীবনের মন অতীত ও ভবিষ্যৎ শরীর সমূহ ইঙ্গিত করে। সমস্ত রকমের বাসনার ভাণ্ডার হচ্ছে জীবের সূক্ষ্ম শরীর। সমস্ত জড় বাসনার ভাণ্ডার সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আত্মার দেহান্তর হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জড় বাসনাগুলির গমনাগমন হবে। চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছা—এগুলি হচ্ছে মনের ধর্ম। মন যতক্ষণ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মন নানা প্রকার জড়সুখ ভোগের বাসনা করতে থাকবে। আর ফলস্বরূপ এক দেহ থেকে অন্য দেহ ধারণ করে চলতে থাকবে। আর ততদিন পর্যন্ত নিত্য আনন্দময় ও চিন্ময় স্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যাবে।

হে রাজন্, কৃষ্ণভক্তির অর্থ হচ্ছে এমন মানসিক অবস্থা নিয়ে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করা, যাতে ভগবান যেভাবে জড় জগৎকে দর্শন করেন, ঠিক সেইভাবে ভক্ত তা দর্শন করতে পারেন। পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকার ফলে এক নিমেষেই অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত

মানসিক বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণভক্তির অর্থ হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণসেবায় যুক্ত করা।

জীব সবসময় জড় ক্ষেত্রে কর্ম করে জড় সুখ উপভোগ করতে চায়। এভাবে জড়জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সর্বদা মনে রাখুন যে, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় পরমেশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত হয়। তার ফলে এই জগতের সমস্ত বস্তুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকুন।

পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে ভূলোকের সমস্ত বস্তু নিষ্পাপ ছিল। ব্রহ্মার চারপুত্র বা চতুষ্কুমার তখন পৃথু মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করেন। সেই চারকুমার—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারকে দর্শন করে পৃথু মহারাজ তাঁদেরকে স্বাগত জানাতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। বিনীতভাবে তাঁদেরকে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়ে, তাঁদের পাদ ধৌত করে সেই জল রাজা নিজমস্তকে সিঞ্চন করলেন। তাঁদের যথাযথ সম্মান জানিয়ে সংযতভাবে পৃথু মহারাজ বলতে লাগলেন, হে মহর্ষিগণ, আপনারা সৌভাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ। আপনাদের দর্শন যোগীদেরও দুর্লভ। জানি না কোন্ পুণ্যে আপনাদের দর্শন পেলাম। যদিও আপনারা সমস্ত লোকে বিচরণ করেন, তবুও কেউ আপনাদের দেখতে পায় না। আপনারা যার গৃহে আসেন, সেই গৃহ ধন্য, সেই গৃহস্থ ধন্য। এমনকি গৃহী ব্যক্তি নির্ধন হলেও। আপনারা ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, আপনারা সর্বদা ছোট্ট বালকের মতো রয়েছেন, আপনারা কত সুন্দর। কিন্তু গৃহীজীবন অমঙ্গলজনক ও বিপদসংকুল। পূর্বকৃত মন্দ কর্মফলে লোকে গৃহসংসারী হয়। তাদের কি মঙ্গলময় পারমার্থিক জীবন লাভের কোনও সৌভাগ্য সম্ভাবনা আছে? সর্বদা চিন্ময় আনন্দে মগ্ন আপনাদের মতো মহর্ষিরা সংসার-দাবানলে সন্তপ্ত ব্যক্তিদের একমাত্র সুহৃৎ। তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, কিভাবে আমরা অচিরেই এই জড় জগতে আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি।

পৃথু মহারাজের বাক্যে চতুঃসন প্রসন্ন হয়েছিলেন। শ্রীসনৎকুমার বললেন, হে মহারাজ, আপনার এইরকম প্রশ্ন সমস্ত জীবের পক্ষে লাভপ্রদ। এই ধরনের আলোচনাও বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই অভিলষিত এবং মঙ্গলজনক।

হে রাজন্, আপনি তো পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের মহিমা কীর্তনে ইতিমধ্যে যুক্ত আছেন। যে-কেউ যখন ভগবানের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা লাভ করে, তখন আপনা থেকেই তার অন্তরের সমস্ত জড় কামনা বাসনা

বিধৌত হয়। শাস্ত্রে পূর্ণরূপে বিচারের দ্বার স্থিরীকৃত হয়েছে যে, মানব-সমাজের কল্যাণের চরম লক্ষ্য হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধিতে আসক্ত না হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি গভীর অনুরাগ লাভ করা। যারা ভক্তি অনুশীলন করছে, ভগবানের আরাধনা করছে, ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন করছে, তাদের আসক্তি ভগবানের প্রতি বৃদ্ধি হচ্ছে। পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে হলে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পরায়ণ ও অর্থলোলুপ ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হয়। মানুষের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে শ্রীহরির মহিমামৃত পান না করে সে শান্তিতে থাকতে পারে না।

পারমার্থিক উন্নতি সাধনে যিনি আগ্রহী, যাঁরা ভগবদ্‌ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী, তাদের প্রথমে (১) অহিংসা আচরণ করতে হবে। (২) মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। (৩) সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করতে হবে। অর্থাৎ এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে যাতে শয়ন, ভোজন, চলন, কাজকর্ম করার সময় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকা যায়। (৪) শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালন করতে হবে। (৫) ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করতেই হয়। (৬) অন্যের সমালোচনা করা উচিত নয়, অর্থাৎ, মানুষ যখন রজো ও তমো গুণে প্রভাবিত থাকে, তখন তাদের ধর্মের পন্থাও সেই গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভগবদ্‌ভক্ত তাদেরকে যথার্থ ধর্ম অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করেন, যাতে ধীরে ধীরে মানুষ সাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত হতে পারে। তা না করে ভক্ত কেবল যদি তাদের সমালোচনা করে, তা হলে ভক্তের নিজের মন ক্ষুব্ধ হবে, সেটি ভাল নয়। (৭) সরল জীবন যাপন করতে হবে। ভোগী বিষয়ীরা আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়। ভক্তরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার ও নিদ্রা গ্রহণ করে না। (৮) দ্বন্দ্বভাব সহ্য করতে হয়। অর্থাৎ এই জগৎ দ্বৈতভাব সমন্বিত। ঋতুর পরিবর্তন হয়। আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিক দুঃখের দ্বারা দেহ-মন প্রভাবিত হলেও সেগুলি সহ্য করে কৃষ্ণস্মরণ করে চলতে হয়। (৯) ভগবানের দিব্য গুণাবলী নিত্য শ্রবণ করতে হয়। তাতে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। (১০) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে চলতে হয়।

হে রাজন্, পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হয়ে তাঁর উপদেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত হৃদয়ের জড় পঞ্চ আবরণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। আত্মা যখন এই জড় জগতে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়, তখন সে বিভিন্ন রকমের বাসনা সৃষ্টি করে এবং সেই কারণে সে জড় চেতনায় বেশি করে আবদ্ধ হয়েই থাকে। আত্মা যখন চিন্ময় আনন্দে স্থিত হয়, তখন ভগবৎ প্রীতি-সেবা ব্যতীত অন্য কর্মে তার রুচি থাকে না। মন যখন জড়সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন মন বিক্ষুব্ধ হয়। বিষয়ভোগ চিন্তা করার ফলে জীবের প্রকৃত চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হয়। এভাবে চেতনাভ্রষ্ট জীব তার পূর্ব স্থিতি, তার বর্তমান স্থিতি কিছুই বুঝতে পারে না। তার আত্ম-উপলব্ধির ক্ষমতা হারিয়ে যায়।

সর্বদা মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিয়ে থাকা উচিত। জ্ঞান হল সে স্বরূপে ভগবানের দাস এবং বিজ্ঞান হল তার স্বরূপের ব্যবহারিক প্রয়োগ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে সংযুক্ত থাকা। মনুষ্য জীবনে শ্রীগুরুদেব ও শাস্ত্রের সাহায্যের মাধ্যমে যদি জীবনের এরকম সদ্ব্যবহার না করা হয়, কেবল দিন দিন অর্থ উপার্জন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ চিন্তায় কাল-যাপিত হয়, তবে আসল স্বার্থ বিনাশ প্রাপ্ত হবে। জ্ঞানশূন্য ও ভক্তিশূন্য হওয়ার ফলে পরবর্তী জীবনে অবশ্যই স্থাবর যোনিতেই জন্ম নিতে হবে। পাহাড়, পর্বত, গাছপালা প্রভৃতি হচ্ছে স্থাবর জীব।

হে রাজন; যারা অজ্ঞান-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ঐকান্তিক ভাবে অভিলাষী, তাদের কখনও তমোগুণের সঙ্গ করা উচিত নয়। তমোগুণী ভোগবাদী কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া উচিত নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, তমোগুণী ভোগবাদী কার্যকলাপ হচ্ছে, ধর্মীয় অনুশাসন বর্জিত কার্যকলাপ। যেমন কসাইখানা খুলে অর্থ উপার্জন করা, ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য নাইট ক্লাব বা বেশ্যাবৃত্তি, অর্থ উপার্জনের জন্য মদের কারবার প্রভৃতি নারকীয় পন্থা।

জড়জাগতিক পুণ্যকর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়সুখভোগের প্রতি বেশি গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের ভগবদ্‌ধামে পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত। সেটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিনাশশীল বস্তুতে আমাদের প্রকৃত সুখ আদৌ সম্ভব নয়। হে মহারাজ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হোন।

অজ্ঞানের সমুদ্র পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা ভয়ংকর হাঙর ও তিমি সংকুল। অভক্তরা যদিও সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা করছে, তবুও আপনি সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-রূপী নৌকার আশ্রয় অবলম্বন করুন। এই সমুদ্র যদিও অত্যন্ত দুস্তর, তবুও তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় নিয়ে আপনি অনায়াসে সমস্ত দুর্বিপাক অতিক্রম করতে পারবেন।

পৃথু মহারাজ বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনারা ভগবানের মতোই কৃপালু। আপনারা ভগবৎ আদেশ পূর্ণরূপে পালন করছেন। আপনাদেরকে আমার কিছু দান করা কর্তব্য, কিন্তু আমার বলে কিছু নেই, সবই সাধু-ব্রাহ্মণদের কৃপা স্বরূপ আমি ব্যবহার করছি। তবুও আমার রাজ্য, বল, ভূমি, রাজকোষ, গৃহসামগ্রী, আমার জীবন—সমস্তই আপনাদের চরণে নিবেদন করলাম। যেহেতু বৈদিক জ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তিই সেনাপতি, রাজ্যশাসক, দণ্ডদাতা ও সমগ্র গ্রহলোকের অধিপতি হওয়ার যোগ্য, তাই তাঁদের কাছেই সব কিছু নিবেদন করা উচিত। সমস্ত মানব-সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও উপকারক হচ্ছেন তিনি, যিনি মানুষদেরকে মূল ভগবৎ চেতনায় জাগরিত করেন।

চতুষ্কুমারের আশীর্বাদ নিয়ে রাজা পৃথু, যিনি ছিলেন একজন দায়িত্বশীল সম্রাট, তিনি একজন পরম ভক্ত রূপে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে লাগলেন। তাঁর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির ফলে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হয়েছিলেন। কোনও ঐশ্বর্য নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করেননি। তিনি অনাসক্ত ছিলেন। তিনি গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর পত্নী অর্চিদেবী। তাঁরা

নিজভাবনার অনুরূপ পাঁচটি পুত্রসন্তান উৎপাদন করেছিলেন। অর্থাৎ সেই পুত্রদের জন্ম ঘটনাক্রমে বা খামখেয়ালীর বশে হয়নি। সমস্ত পবিত্র সংস্কার সাধন করে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উপযুক্ত শাসকরূপে গড়ে তোলার মানসিকতা নিয়ে তাঁরা সন্তানের মাতাপিতা হতে যত্ন নিয়েছিলেন। পৃথু মহারাজের সমস্ত কর্মে, প্রত্যেক প্রজা প্রসন্ন থাকত। তিনি সৌন্দর্যে, বিক্রমে, বাৎসল্যে, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় এবং সর্বোপরি ভগবদ্‌ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপনে অতুলনীয় ছিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণু ও পরমবৈষ্ণব চতুষ্কুমারের কৃপাদৃষ্টি পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

শ্রীস্বায়ম্ভুব মনু

হিমালয় পর্বতে এক বলশালী যক্ষ দ্বারা উত্তম নিহত হল। বৈমাত্রেয় ভাই উত্তমের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ধ্রুব মহারাজ তাঁর রথে করে অলকাপুরী আক্রমণ করেন। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বীর যক্ষসেনা তাদের পরিঘ, প্রাণশূল, ভূশণ্ডী প্রভৃতি মহাস্ত্র বর্ষণ দ্বারা ধ্রুব মহারাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অদ্ভুতকর্মা ধ্রুব মহারাজ অতি দ্রুত গতিতে বাণ বর্ষণ করে বহু সংখ্যক যক্ষকে হত্যা করলেন। ধ্রুবের সঙ্গে যক্ষরা কিছুতেই পেরে উঠল না। মায়াবী যক্ষরা ঝড়, রক্ত বৃষ্টি বহুবিধ হিংস্র জন্তু সৃষ্টি করল। বড় বড় অজগর, সিংহ, বাঘ ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করতে এল। সেই দৃশ্য দেখে মহর্ষিরা কল্যাণকর প্রেরণা দিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, সর্বদুঃখহারী ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করো, তাতে মৃত্যু থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।'

ধ্রুব মহারাজ ঋষিবাণী শুনে জল স্পর্শ করে আচমন পূর্বক শ্রীনারায়ণ নির্মিত বাণ ধনুকে যুক্ত করলেন। নারায়ণাস্ত্র দেখে যক্ষনির্মিত মায়া উধাও হয়ে গেল। ধ্রুব মহারাজ যে যক্ষকে দেখতে পান অমনি তাকে বধ করেন। এভাবে বহু যক্ষ ভক্তহাতে নিহত হয়ে ব্রহ্মালোকে উন্নীত হল।

ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু দেখলেন যে তাঁর পৌত্র ধ্রুব এমন অনেক যক্ষদেরকে বধ করছে যারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়, তখন তিনি এসে ধ্রুব মহারাজকে সৎ উপদেশ দিলেন।

হে বৎস, যুদ্ধ বন্ধ কর। প্রকৃতপক্ষে যারা অপরাধী নয়, সেই সমস্ত যক্ষদের হত্যা করে এখন তুমি তোমার ক্রোধের সীমা অতিক্রম করছ। অনর্থক ক্রুদ্ধ হওয়া সমীচীন নয়, তা হচ্ছে নারকীয় জীবনের পথ। তুমি যে নির্দোষ যক্ষদের বধ করছ, তা মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত নয়, এবং তা আমাদের পরিবারের উপযুক্ত কর্মও নয়। কারণ ধর্ম ও অধর্মের নিয়ম সম্বন্ধে তোমার জানাও উচিত। তোমার ভাইয়ের প্রতি তুমি অত্যন্ত স্নেহশীল আছো। যক্ষের হাতে তোমার ভাইয়ের মৃত্যুতে তুমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছ। কিন্তু তুমি বিবেচনা করে দেখো, মাত্র একজন যক্ষ

তোমার ভাই উত্তমকে বধ করেছে, সেই একজনের অপরাধে, তুমি অসংখ্য জন নির্দোষ যক্ষকেও বধ করেছ। একটা পশু মনে করে অন্য আরেকটি পশুর দেহ হচ্ছে তার খাদ্য, সেজন্য দেহাত্মবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হয়ে এক পশু অন্য পশুকে আক্রমণ করে। কিন্তু একজন মানুষের, বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তের পক্ষে সেরকম আচরণ করা উচিত নয়। অনর্থক জীবহত্যা উচিত নয়।

ভগবানের বৈকুণ্ঠধাম লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তুমি এত ভাগ্যবান যে, সর্বজীবের পরম আশ্রয় শ্রীভগবানের আরাধনা করে সেইরকম একটি ধাম ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত হয়েছ। তুমি শুদ্ধভক্ত। তাই ভগবান সর্বদা তোমার কথা চিন্তা করেন, অন্যান্য ভক্তরা তোমাকে শ্রদ্ধা করেন। তোমার পক্ষে এরকম নিন্দনীয় কার্য শোভা পায় না।

সেই ভক্তের প্রতি ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন, (১) যিনি মূঢ়লোকদের আচরণে তিতিক্ষা বা ধৈর্য ধরে সয়ে থাকেন। (২) যিনি অজ্ঞান লোকদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন যাতে তারা ভক্তি স্তরে আসতে আগ্রহান্বিত হয়। (৩) যিনি সতীর্থ ভক্তদের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করেন। (৪) যিনি প্রত্যেক জীবকেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করেন।

ভক্ত মানে সকলের বন্ধু। তিনি কারও প্রতি বৈরীভাবাপন্ন নন। পরমেশ্বর ভগবান কারও প্রতি প্রসন্ন থাকলে সে তার জীবদ্দশাতেই স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এভাবে সে জড়াপ্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করে। পঞ্চ মহাভূত থেকে জড় জগতের সৃষ্টি শুরু হয়। সেই পঞ্চভূত স্ত্রীদেহ ও পুরুষদেহে পরিণত হয়। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি হয়। হে ধ্রুব, তোমার ভাইয়ের জড় দেহের মৃত্যুর জন্য প্রকৃতপক্ষে যক্ষেরা দোষী নয়, তা জড়া প্রকৃতির কাজ। ভগবানের অনেক রকমের শক্তি আছে, তারাই অনেক রকমের সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে কার্য করে। এই সমস্ত পঞ্চভূতের শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধও ক্ষণিক। আত্মার

বিনাশ হয় না, বা কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না। ভগবানের মায়িক জড়া শক্তি দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটে থাকে।

হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান কিন্তু এই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। ভগবান যখন প্রেরণা দেন, তখন অন্য অনেক কারণ ও কার্য উৎপন্ন হয়, তার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়। ভগবান সমস্ত জড়া প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অতীত।

হে ধ্রুব! তুমি জানবে, কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সর্বত্র বিদ্যমান, সবার প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই তাঁর শত্রু বা মিত্র নয়। কালের অধীনে সকলেই তাদের নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে। ভগবান সবাইকেই সমান সুযোগ দেন, কিন্তু জীব তার নিজের কর্ম অনুসারে এই জগতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে।

বিভিন্ন রকমের জীবনের প্রকার ভেদ, কত রকমের সুখ ও দুঃখ দেখে তার কারণ ভাবতে গিয়ে কেউ বলে 'কর্মের ফল' কেউ বলে 'স্বভাব', কেউ বলে 'কাল', কেউ বলে 'ভাগ্য', আবার কেউ বলে 'কামনা-বাসনা'। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে যে, পরমেশ্বরের সঙ্গে নিত্য ভক্তিময় সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে এই জড় সংসারে জীব পতিত হয়েছে এবং বিভিন্ন রকমের কর্ম করছে, তার ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে।

হে বৎস, এ সব চিন্তা করলে তুমি বুঝতে পারবে যে, কুবেরের অনুচর এই সমস্ত যক্ষরা তোমার ভাই উত্তমের বধকর্তা নয়। জীবের জন্ম-মৃত্যু সর্বকারণের পরমকারণ ভগবানের দ্বারাই হয়, তিনিই জড়জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও যথা সময়ে ধ্বংস করেন, তবুও তিনি এসব কার্যকলাপের এবং জড়াপ্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনিই পরম নিয়ন্তা। তাই তাঁর শরণাগত হয়ে থাকো। তিনিই জগতের উন্নতির পরম লক্ষ্য।

হে ধ্রুব, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তুমি বিমাতার বাণীতে মর্মাহত হয়ে, তুমি ভগবানকে পাওয়ার জন্য যোগ অনুশীলন করেছিলে, ফলে ইতিমধ্যে

ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছ। এখন সর্বদা তোমার মন শ্রীহরিচেতনায় নিবদ্ধ রাখা কর্তব্য। সেটাই জীবের স্বরূপ অবস্থা। তার ফলে তুমি দেখবে যে, এই জড় সংসারে সমস্ত ভেদ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। হে বৎস, পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রোধ হচ্ছে সব চেয়ে বড় শত্রু। তুমি সেসব বিচার কর। তাতে তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে। এই জড় সংসার থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেতে চায়, তার কখনও ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। কেননা, ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি অন্য সকলের উদ্বেগের কারণ হয়। তুমি মনে করছ যক্ষরা তোমার ভাইকে হত্যা করেছে, সেই কারণে তুমি বহু সংখ্যক যক্ষকে হত্যা করেছ। কিন্তু তোমার এই আচরণের কারণে, শিবের ভ্রাতা, যিনি দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ সেই কুবের ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। সেই সূত্র ধরে আবার শিবের প্রতিও অত্যন্ত অসম্মানজনক কর্ম হচ্ছে। শিব নির্বিকার থাকলেও কুবেরের ক্রোধে আমাদের বংশহানির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আগে ভাগে বিনম্র বচন, প্রণতি ও স্তুতির দ্বারা কুবেরকে প্রসন্ন করা তোমার কর্তব্য। আমাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে কেউ যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হন। কেউ ক্রুদ্ধ হলে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি, পরিবারের প্রতি অথবা সমাজের প্রতি হানি সাধন করতে পারে।

শ্রীযমরাজ

সমস্ত জীবের ধর্ম-অধর্মের বিচারক যমরাজ। তিনি সূর্যদেবের পুত্র। তিনি নরকলোকের অধিপতি। পৃথিবী থেকে ৭ লক্ষ ৯২ হাজার মাইল নীচে নরক নামক গ্রহলোক অবস্থিত। নরক গ্রহের সংযমনী নামক যমপুরী রয়েছে। যমরাজের প্রধান হিসাবরক্ষকের নাম চিত্রগুপ্ত। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই যমরাজের দুতেরা পৃথিবীতে ত্যক্তদেহ পাপাত্মাদের যমপুরীতে টেনে নিয়ে যায়।

প্রাচীনকালে কানপুরের কাছে কনৌজ নামক স্থানে অজামিল নামক এক ব্যক্তি দেহত্যাগ করলে যমদূতেরা তাকে পাশবদ্ধ করে নিয়ে যেতে উদ্যত হল। চারজন বিষ্ণুদূত এসে তাদের তীব্রভাবে বাধা প্রদান করেন। পাপাচারী অজামিলকে যমের বিধানে শাস্তি প্রদানের জন্য যমদূতেরা নিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়ে বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের বিতাড়িত করেছিলেন। যমদূতদের কাছে তা এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। তাই বিষ্ণুদূতদের দ্বারা পরাভূত হয়ে যমদূতেরা সংযমনীপুরীর অধীশ্বর যমরাজের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছিল—

হে প্রভু, এই জগতের শাসনকর্তা কয়জন? বিচারকর্তা কয়জন? যদি বহুজন থাকে, তবে তাদের পরস্পরের বিরোধী অভিমত থাকতে পারে। ফলে, কে দণ্ডনীয় হবে, কে পুরস্কৃত হবে, তা তো বোঝা দায় হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছিলেন, বিচারক এবং তাঁদের বিচার অবশ্যই নির্ভুল ও বিরোধ-বর্জিত হওয়া কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, অজামিলের ব্যাপারে যমরাজের অবস্থা বেশ অপ্রতিভ ছিল, কারণ যমদূতদের অজামিলকে গ্রেপ্তার করার প্রচেষ্টা ন্যায়সঙ্গত ছিল, কিন্তু বিষ্ণুদূতেরা তাদের নিরস্ত করেন। এই অবস্থায় যমরাজ যদিও বিষ্ণুদূত ও যমদূত উভয়ের দ্বারাই অভিযুক্ত হয়েছেন, তবুও তাঁর বিচার সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন, কারণ তিনি ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

যমদূতেরা যমরাজকে বলছিল, আমরা জানতাম, আপনি সর্বোচ্চ বিচারক, সমস্ত দেবতাও আপনার অধীন। সমস্ত জীবের আপনি অধীশ্বর।

আপনিই সমস্ত মানুষের পাপ-পুণ্যের একমাত্র বিচারকর্তা। কিন্তু এখন আপনার বিহিত দণ্ড আর কার্যকরী হচ্ছে না। চারজন সিদ্ধপুরুষ আপনার আদেশ লংঘন করছেন। আমরা আপনার আদেশে পাপী অজামিলকে পাশবদ্ধ করে নিয়ে আসছিলাম অমনি সেই অদ্ভুত দর্শন সিদ্ধপুরুষেরা তার পাশবন্ধন ছেদন করে তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। আরও অজামিলকে তারা আশ্বাস দিয়েছেন যে, 'ভয় করো না।' হে প্রভু! তারা কে? দয়া করে তাদের পরিচিতিও বলুন।

যমরাজ তাঁর দূতদের বলতে লাগলেন, যদিও তোমরা আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমারও ঊর্ধ্বে পরমনিয়ন্তা রয়েছেন। স্বর্গরাজ ইন্দ্র থেকে শুরু করে সমস্ত দেবতা, এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের যাঁরা অধ্যক্ষ সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যাঁর অংশ তিনি হলেন পরমেশ্বর ভগবান। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বাধীন। তিনিই সকলের অধীশ্বর। তোমরা যাদেরকে দর্শন করে এসেছ, তারাও দুর্লভ দর্শন। বিষ্ণু আমার নিয়ন্তা। বিষ্ণুদূতেরাও আমাদের ঊর্ধ্বে। তাই বিষ্ণুদূতেরা যাদের রক্ষা করেন, তোমরা তাদেরকে স্পর্শও করতে পারো না।

দূত—বিষ্ণুদূতেরা কাদেরকে রক্ষা করেন?

যমরাজ—যারা ভগবদ্‌ভক্তি অনুশীলন করে।

দূত—অজামিল তো অভক্ত, পাপাচারী?

যমরাজ—অজামিল মরণকালে 'নারায়ণ' এই ভগবানের নাম কীর্তন করেছে। মরণকালে ভগবানের নাম স্মরণ করতে পারলে তাকে তোমরা আর নরকে আনতে পারবে না। তাকে বিষ্ণুদূতেরা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে।

দূত—মনুষ্য সমাজের প্রকৃত ধর্ম কি?

যমরাজ—পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তিযোগ, তা-ই মানব-সমাজে জীবের পরম ধর্ম।

হে ভৃত্যগণ, ভগবানের পবিত্র নামের মাহাত্ম্য দেখো। মহাপাপী অজামিল তার পুত্রকে সম্বোধন করে, অজ্ঞাতসারে, এই নাম গ্রহণ করার ফলে নারায়ণ-স্মৃতির উদয় হয়। তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হয়।

তোমরা জানবে যে, ভগবানের নাম, গুণ এবং কর্মের কীর্তনের ফলে সমস্ত পাপ থেকে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়। লোকে রোজ রোজ জড়জাগতিক বিষয়ী লোকের নাম গুণ ও কর্মের কথা কীর্তন করে থাকে। কিন্তু ভগবানের নাম গুণ কীর্তন হল পাপমোচনের জন্য একমাত্র উপদিষ্ট পন্থা। নিরপরাধে কেউ যদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তা হলে সেই উচ্চারণ অশুদ্ধ হলেও সে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবে। অজামিল পাপী হলেও মৃত্যুকালে তার পুত্রকে 'নারায়ণ' বলে সম্বোধন করে, সেই নাম উচ্চারণের ফলে, পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পেরেছে।

হে ভৃত্যগণ, ভগবানের মায়াতে মোহিত হওয়ার ফলে যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনি প্রমুখ ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ ভাগবত ধর্মের রহস্য জানতে পারেননি। দ্বাদশ মহাজন ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন—(১) ব্রহ্মা, (২) নারদ, (৩) শিব, (৪) চতুষ্কুমার, (৫) দেবহূতি পুত্র কপিল, (৬) স্বায়ম্ভুব মনু, (৭) প্রহ্লাদ মহারাজ, (৮) রাজর্ষি জনক, (৯) গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, (১০) দৈত্যরাজ বলি, (১১) শুকদেব গোস্বামী এবং (১২) আমি যম।

আসল ধর্ম হচ্ছে ভাগবত ধর্ম। এটা যে জানে না, সে ভগবদ্‌ভক্তি অনুষ্ঠান বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দিব্য মহিমা বুঝবে না। ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ মুনিঋষিরা বিশেষত যজুর্বেদ, সামবেদ ও ঋক্‌বেদে বর্ণিত কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট। তাই তাদের বুদ্ধি জড়ীভূত হয়ে গেছে। তারা জড়সুখ ভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া ইত্যাদি অনিত্য ফল লাভের জন্য কর্ম অনুষ্ঠানের উপকরণ সংগ্রহেই ব্যস্ত। তারা হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে ধন-অর্থ-কাম ও মোক্ষের প্রতিই আগ্রহশীল।

অতএব, যারা বুদ্ধিমান মানুষ, তারা এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে সর্বান্তঃকরণে সমস্ত মঙ্গলময় গুণের আকর সর্বান্তর্যামী ভগবানের পবিত্র নামকীর্তন রূপ ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে। এই পন্থা দ্বারা তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান বিবেচনা করে। এই ধরনের ব্যক্তিরা আমার দণ্ডার্হ নয়। সাধারণতঃ তারা কোন পাপকর্ম করে না। কিন্তু কেউ যদি ভ্রম, প্রমাদ বা মোহবশত কখনও কোনও পাপ করে, তবুও সে নিরন্তর হরিনাম কীর্তন করার ফলে সেই পাপ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

হে দূতগণ, তোমরা কখনও ভগবানের ভক্তদের কাছে যাবে না। কারণ তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত। পৃথিবীতে যে মানুষেরা ভক্ত, তাঁদের গুণগাথা স্বর্গের দেবতারা, সিদ্ধরা গান করেন। তোমরা কখনও তাঁদের কাছে যাবে না।

হে দূতগণ, ভক্তরা জড়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত নয়, তাঁরা সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু পান করেন। যে ব্যক্তিরা সেই ভক্তদের সঙ্গ করে না, কৃষ্ণপাদপদ্ম-অমৃত পানে যার কোনও ইচ্ছা নেই, যারা কেবলমাত্র মৈথুন সুখ উপভোগের জন্য গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্ত, সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আমার কাছে দণ্ডভোগের জন্য নিয়ে এসো।

হে ভৃত্যগণ, সেই সমস্ত পাপীদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, (১) যাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ইত্যাদি কীর্তন করে না। (২) যাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না। (৩) যাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রণত হয় না। (৪) যারা বৈষ্ণবব্রত অনুষ্ঠান করে না।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, যদিও যমরাজ অপরাধের অতীত, তবুও তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর সেবকেরা অজামিলকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল, যার ফলে এক মহা অপরাধ হয়েছিল। ন্যায়-শাস্ত্র অনুসারে ভৃত্য যদি কোন ভুল করে তা হলে তার প্রভুকে সেই জন্য দায়ী হতে হয়। যমরাজ

সেই নীতি অনুসারে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে, ভৃত্যগণ সহ কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি ভগবান শ্রীহরির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

যমরাজ বলেছিলেন, হে পুরাণপুরুষ, দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। অজ্ঞানতাবশত আমরা অজামিলকে আপনার ভৃত্য বলে চিনতে পারিনি এবং তার ফলে আমরা অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছি। তাই আমরা আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। হে ভগবান, যেহেতু আপনি সমস্ত সদ্‌গুণ-সমন্বিত, তাই দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীকপিলদেব

মা দেবহূতি দেবী তাঁর পুত্র কপিলদেবের কাছে বলছেন, "আমি এই জড় জাগতিক বিষয়ে মোহগ্রস্ত, আমি সেজন্য তমসাবৃত সংসারকূপে পতিত হয়েছি, আমার এখন কিভাবে থাকা উচিত, বা কি করা কর্তব্য আমাকে শিক্ষা দাও।

কপিলদেব বললেন, মা, শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের লীলা এবং কার্যকলাপের আলোচনা করলে হৃদয় ও কানের প্রীতি ও সন্তুষ্টি হয়। ভগবদ্ কথা আলোচনার ফলে দুঃখময় সংসার থেকে ধীরে ধীরে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে হৃদয়ে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি এবং অবশেষে প্রেমভক্তির উদয় হয়।

কেউ যখন ভগবদ্‌ভক্তিতে যুক্ত হয়, তখন সে তার মনকে সংযত করতে সক্ষম হয়। মন অসংযত মানেই ভগবদ্‌ভক্তিতে যুক্ত নয়।

দেবহূতি বললেন, আমি মন্দবুদ্ধি। কিভাবে ভক্তি অভ্যাস করব? কিভাবে ভগবদ্‌পাদপদ্মের সেবা লাভ করব? কিভাবে ভক্তিযোগ করতে হয়?

কপিলদেব বললেন, ভগবদ্‌ভক্তি সম্পাদন করতে হলে—

(১) সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হয়। অর্থাৎ তাদের দেহ দর্শন না করে আত্মাকে দর্শন করতে হয়, প্রতি জীবাত্মাই ভগবানের বিভিন্ন অংশকণা।

(২) কারও প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতে নেই। অর্থাৎ শত্রুতা বা হিংসাভাব রাখা উচিত নয়।

(৩) কারও সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রাখতে নেই। অর্থাৎ বৈরীভাব থাকবে না মানে এই নয় যে, সবার সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। ভক্ত সর্বদা ভক্তি সম্পাদনে আগ্রহী এবং ভক্তিসাধনার পথে এগোবার উদ্দেশ্যে ভক্তদের সঙ্গেই তাঁর সঙ্গ করা কর্তব্য। তিনি কাউকে তাঁর শত্রু বলে মনে করেন না, তবুও তিনি কেবল তাঁদের সঙ্গেই মেলামেশা করেন, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত।

(৪) ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতে হয়। অর্থাৎ যৌনজীবন সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সবচেয়ে ভাল। অন্যথায় ভক্তের পক্ষে ধর্মের অনুশাসন অনুসারে বিবাহ করে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করতে হবে, কেবলমাত্র ভক্তসন্তান উৎপাদনের জন্যই দম্পতি মিলিত হবেন।

(৫) মৌনব্রত অবলম্বন করতে হয়। অর্থাৎ ভক্ত ভক্তিকর্মে ব্যস্ত থাকবে, অনর্থক কথা বলবে না। অর্থহীন বাক্যালাপে সময় নষ্ট করবে না। ভক্ত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা বলবে।

(৬) পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত কর্মের ফল নিবেদন করে স্বধর্ম পালন করতে হয়। অর্থাৎ ভক্ত কখনও ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কোন কাজ করে না, যা কিছু আয়োজন করবে, যা কিছু খাবে, যা কিছু উপার্জন করবে, তা সবই ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্য নিবেদন করবে।

(৭) অনায়াসে যা উপার্জিত হয় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অর্থাৎ জীবিকার জন্য, শরীর ধারণের জন্য কিছু রোজগার কর্ম করতে হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ধন সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। কেবল অর্থ উপার্জনের জন্যই সারাদিন সারারাত কঠোর পরিশ্রম করা কর্তব্য নয়। অধিকাংশ মূল্যবান সময় কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে নিয়োগ করতে হয়। অত্যন্ত ধনী থেকে অত্যন্ত গরীব পর্যন্ত সবাই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে পারে।

(৮) প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয়। অর্থাৎ দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আহার করা উচিত। জিহ্বার লালসায় অত্যাহার কর্তব্য নয়। আবার শস্য ফলফুল শাক দুধ ইত্যাদি ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। যা মানুষের আহার্য নয়, তা বর্জনীয়।

(৯) ভক্তের চিন্তাশীল হওয়া উচিত। অর্থাৎ তাঁর কর্তব্য সর্বদা কৃষ্ণকথা চিন্তা করা এবং কিভাবে আরও ভালভাবে ভগবৎ সেবা করা যায়, সেই কথাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। ভক্ত কৃষ্ণভক্তিতে নিজ অবস্থার উন্নতি সাধনের চিন্তায় মগ্ন থাকে।

(১০) নির্জন স্থানে বাস করা উচিত। অর্থাৎ বিষয়ী ভোগী ব্যক্তিরা তাদের জড়জাগতিক উন্নতি সাধনে অত্যন্ত আগ্রহী এবং জড় সাংসারিক কর্মে অত্যন্ত তৎপর থাকলেও, ভক্ত সর্বদা আপন মনে কৃষ্ণভক্তি সম্পাদনে আগ্রহী থাকবে। এমন স্থানে বাস করতে হবে, যেখানে অধিক সংখ্যক জড়বাদী লোকের প্রভাব নেই।

(১১) সর্বদা প্রশান্ত চিত্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ সহজ সরলভাবে জীবন যাপন করতে হবে। জাগতিক বিষয় নিয়ে চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ ভাব পোষণ করা অনাবশ্যক। কিভাবে কৃষ্ণকৃপা লাভ করা যায় সেই চিন্তা করা উচিত।

(১২) সবার প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাঁরা ভক্তিপথে যুক্ত তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সেবাপরায়ণ হওয়া, যাঁরা নাস্তিক, তাদের কাছে কেবলমাত্র কার্যসাধনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ধৈর্য ধরে থাকা।

(১৩) সরল নিরীহ ব্যক্তির প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া উচিত। অর্থাৎ যারা সরলচিত্ত, যারা নাস্তিক নয়, অথচ পারমার্থিক উপলব্ধিও তেমন নেই, তাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হতে হবে এবং তাদেরকে কৃষ্ণভক্তি পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দিতে হবে।

(১৪) আত্মবান থাকতে হবে। অর্থাৎ ভক্ত কখনও নিজেকে একটা দেহ বা মন বলে মনে করবে না। প্রকৃত স্বরূপে সে সর্বদাই কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং চিন্ময় আত্মা—সেই বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকবে। তাহলে ভক্তিমার্গে সে সফল হবে।

দেবহূতি প্রশ্ন করলেন, হে ব্রাহ্মণ! জড়া প্রকৃতি কি কখনও জীবাত্মাকে মুক্তি দেয়? কেননা তাদের পরস্পরের আকর্ষণ নিত্য। লোকে যা করুক, যতক্ষণ জড়াপ্রকৃতি তার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে বেঁধে রাখে, ততক্ষণ তার পক্ষে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? যদিও তত্ত্ব বিচার করে ভববন্ধন ভয় দূর হতে পারে, কিন্তু বন্ধনের কারণটি নষ্ট না হলে ভয় তো পুনরায় থাকবে?

কপিলদেব বললেন, 'ঐকান্তিকভাবে ভক্তি অনুশীলন করলে জড়া প্রকৃতির প্রভাব দূর করা সম্ভব হয়। স্বপ্নাবস্থায় কারও চেতনা প্রায় আচ্ছাদিত থাকে, তখন নানা রকমের অশুভ বস্তু দর্শন হয়। কিন্তু যখন সে জেগে উঠে পূর্ণ চেতনায় অধিষ্ঠিত হয় তখন আর এই সমস্ত অশুভ বস্তু তাকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে না। কৃষ্ণভক্তি চেতনায় অধিষ্ঠিত থাকলে জড়াপ্রকৃতি বা মায়া তাকে প্রভাবিত করবে না।

দেবহূতি বললেন, তবে অনেক লোককে দেখা যায়, যারা ভক্তি অনুশীলন করেও মায়া প্রভাবিত হয়ে ভক্তিযোগ পরিত্যাগ করে, কেন?

কপিলদেব বললেন, বহু জন্ম ধরে যারা ভগবৎ সেবা করে এসেছে, তারা এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কিছুতে আসক্ত হয় না, তাঁদের চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। তারা ভক্তিপথ থেকে কখনও বিচ্যুত হয় না। ভক্তিসাধন পথে যারা একাগ্র নয়, তারাই মায়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। মানুষ যথাসাধ্য স্বধর্ম অর্থাৎ নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করবে এবং বিধর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করবে। ভগবানের কৃপায় এই জীবনে যা সে পেয়েছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য এবং সানন্দে আত্মতত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের আরাধনা এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে চলতে হবে।

দেবহূতি বললেন—কিভাবে মনকে স্থির করতে হয়?

কপিলদেব বললেন—কেউ যদি শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে, শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, তবে মনও স্থির হয়ে যায়। ভগবানের রূপের ধ্যান করা কর্তব্য। ভগবান অত্যন্ত সুন্দর দর্শন, তিনি সর্বলোকের আরাধ্য, তিনি নবকিশোর। তিনি সর্বদা তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপা বিতরণে উৎসুক। ভগবানের নাম, গুণ, রূপ, মহিমা কীর্তন করতে হয়। ভগবান ও ভক্তের ধ্যান করতে হয়। মন যতক্ষণ না স্থির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শাশ্বত রূপের ধ্যান করতে হয়।

দেবহূতি বললেন,—কিভাবে ভগবানের রূপের ধ্যান করতে হয়?

কপিলদেব বললেন—(১) প্রথমে ভগবানের ধ্বজ বজ্র পদ্ম প্রভৃতি মাঙ্গলিক চিহ্ন সমন্বিত পাদপদ্ম ধ্যান করতে হয়। সুন্দর রক্তবর্ণ পদতল এবং নখশোভা সমন্বিত চরণকমল। যে চরণের ধৌত জল গঙ্গা। তা শিরে ধারণ করে শিব মঙ্গলময় হয়েছেন। লক্ষ্মীদেবী যে চরণ অতি যত্ন সহকারে সেবা করতে থাকেন। চরণ ধ্যানে পর্বত পরিমাণ পাপরাশি ধ্বংস হয়ে যায়। (২) তারপর, ভগবানের উরুদ্বয়ের ধ্যান করতে হয়। যা সর্বশক্তির আধার, অতসীপুষ্পের মতো শুভ্রশ্যাম উরুদ্বয়। ভগবানের পরিধ্যানে কাঞ্চিদাম বেষ্টিত পীতবসন। (৩) তারপর, নাভিদেশ, যেখান থেকে পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয়। সেই পদ্মটি প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার আবাসস্থল। (৪) তারপর ভগবানের স্তনদ্বয়ের ধ্যান করতে হয়, যা দামী মরকত মণি দ্বারা অলংকৃত। ভগবানের বক্ষদেশে দুগ্ধধবল উজ্জ্বল মুক্তামালা। মহালক্ষ্মী স্বর্ণরেখারূপে তাঁর বক্ষে বিরাজমান। ভগবানের বক্ষদেশ মনের সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস ও নয়নের পূর্ণ সন্তোষ প্রদানকারী। (৫) তারপর তাঁর কণ্ঠদেশ ধ্যান করতে হয়। ভগবানের কণ্ঠে দোদুল্যমান কৌস্তুভ মণি শোভিত। (৬) তারপর ভগবানের বাহুর ধ্যান করতে হয়, যা দেবতাদের সমস্ত শক্তির উৎস। তাঁর হাতের অলঙ্কার এবং হস্তধৃত সুদর্শনাদি চিন্ময় অস্ত্রাদি। (৭) তারপর ভগবানের মুখমণ্ডলের ধ্যান করতে হয়। তাঁর সুকোমল গণ্ডস্থল দীপ্তিমান মকরকুণ্ডল সঞ্চালনে উজ্জ্বল। তাঁর উন্নত নাসিকা মুখকমলকে অপূর্ব শোভায় উদ্ভাসিত করছে। শিরোদেশে কুঞ্চিত কেশদাম। পদ্মসদৃশ নয়ন। নৃত্যপর ভ্রূযুগল যা কামদেবকেও মোহিত করে। অনুকম্পাপূর্ণ দৃষ্টি। সুস্নিগ্ধ অধরে মৃদুমন্দ হাস্য। ভক্তি সহকারে এভাবে ভগবানের ধ্যান করলে জড়া প্রকৃতির ভয়ঙ্কর ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মনোরম হাস্যের ধ্যান করলে শরণাগত ব্যক্তির গভীর শোক থেকে উৎপন্ন অশ্রুসমুদ্র বিশোষিত হয়।

দেবহূতি বললেন,—হে প্রভু! কৃপা করে ভক্তিমার্গ বর্ণনা করুন।

কপিলদেব বললেন—মাতা! ভক্তিমার্গ বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন রকমের।

(১) যে ব্যক্তি ভক্তি অনুশীলন করছে, কিন্তু সে তার নিজের ব্যক্তিত্বের গর্বে গর্বিত, অপরের প্রতি হিংসাপরায়ণ, মাৎসর্যপরায়ণ, ক্রোধী। নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে মনে করে। এইভাবে যে ভক্তি সম্পাদিত হয় তা শুদ্ধ নয়। মিশ্রভক্তি। এরকম ভক্তিকে বলা হয় তামসিক। তা সবচেয়ে নিম্নস্তরের। এরকম তথাকথিত ভক্ত মনে করে আমিও ভগবানের মতো হয়ে যাব।

(২) যে ব্যক্তি ভগবানের প্রীতি চিন্তা না করে নিজের জড়সুখভোগের উদ্দেশ্যে ভগবানের কৃপা লাভ করে নিজের যশ বা ঐশ্বর্য লাভ করতে চায়, তার সেই ভক্তি হচ্ছে রাজসিক ভক্তি।

(৩) ভক্ত যখন সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবানের পূজা করে এবং তার কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করে, তখন তার ভক্তি সাত্ত্বিক।

(৪) কোনও উদ্দেশ্য বা হেতু বা কারণ ছাড়াই অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণ বশে ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করাকে নির্গুণ ভক্তি বা শুদ্ধ ভক্তি বলা হয়। ভগবানকে ভালবাসা, ভগবানের ইচ্ছা পূরণ করা ছাড়া শুদ্ধ ভক্তের নিজের কোনও আলাদা স্বার্থ থাকে না। এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত সেবা চিন্ময়। তা কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হয় না।

দেবহূতি বললেন—ভক্তের দর্শন বা ভাব কি হওয়া কর্তব্য?

কপিলদেব বললেন—ভক্তের নিয়মিতভাবে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা, ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশ্যে পূজার উপচার এবং প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত। নিষ্কাম চিত্তে প্রতি জীবকে চিন্ময় ভাব সমন্বিত বলে দর্শন করা উচিত। ভক্তের উচিত গুরু-আচার্যদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা এবং সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলা। নিত্য পরমার্থ কথা শ্রবণ করা উচিত। শ্রীভগবানের দিব্য নাম সংকীর্তন করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

দেবহূতি বললেন,—হে প্রভু! কৃপা করে আমার জন্য এবং জনসাধারণের জন্য জন্মমৃত্যুর নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়ার কথা বর্ণনা করুন, যাতে সেই সমস্ত বিপদের কথা শুনে আমরা জড় জাগতিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে মুক্ত হওয়ার যত্ন করতে পারি। বদ্ধ জীব যাতে বুঝতে পারে যে, ভক্তিপন্থা না গ্রহণের ফলে আরও আমরা অধঃপতিত হচ্ছি।

করুণাময় কপিলদেব বললেন—জীব এই সংসারে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, সেই যোনিতেই বিশেষ সন্তোষ বোধ করে। বিষ্ঠাভোজী শূকরের জীবন যত ঘৃণ্য হোক, তার কাছে সেই জীবনই আকর্ষণীয় ও সুখকর। এমন কি নরকে পতিত হলেও নারকীয় অবস্থাটি নারকী জীবের কাছে সুখকর বলে মনে হয়। যদিও জীব এই জগতের অনিত্য দেহ, অনিত্য সমাজ, অনিত্য সম্বন্ধ পেয়েছে, তবুও তাতে সে গভীরভাবে আসক্ত থাকার ফলে বহুবিধ দুঃখ ও শোকের কবলে পতিত হচ্ছে, এবং আবহমান কাল ধরে সে বিভিন্ন জন্ম নিয়ে জড় জগতে ভ্রমণ করছে। তবুও সে মনে করে সেইটিই সুখ। সে এতই মূর্খ যে, পত্নীর হাসিমুখ দেখে, শিশু সন্তানের আধো আধো বুলি শুনে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। পরিবার আত্মীয়বর্গের ভরণ পোষণের জন্য তাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়, অনেক সময় পাপ-কর্মফল অর্জন করতে হয়। আবার যখন ভরণ পোষণে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন বৃদ্ধ বলদের মতো সেই পরিবারে অযত্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়। তবুও সেই মূর্খ সংসার-জীবনের প্রতি বিরক্ত হয় না, তার আসক্তি কমে না। লোকে তাকে অবজ্ঞাভরে পালন করে। জরার প্রভাবে সে বিরূপ আকৃতির হয়। সে মৃত্যুর দিন গুণতে থাকে। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, সব রকমের রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে। দেহের ভেতরে বায়ুর চাপে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। কফে শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যায়। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়। গলা দিয়ে ঘুর ঘুর শব্দ বেরোয়। মৃত্যু-শয্যায় পড়ে থাকে। অত্যন্ত অসহ্য বোধ করে। আত্মীয় স্বজনদের তার কথা বোঝাতে পারে না। অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

মৃত্যুকালে বীকট চেহারার যমদূতদেরকে সে আসতে দেখে ভয়ে মলমূত্র ত্যাগ করতে থাকে। অন্যেরা তাকে উদ্ধারের কোনও চেষ্টা না করে বিলাপ করে কেবল কাঁদতে থাকে। যমদূতেরা শক্ত দড়িতে তার গলায় বাঁধে, তারপর তার সূক্ষ্মদেহকে আবৃত করে কঠোর দণ্ড দেওয়ার জন্য যমলোকে টানা হেঁচড়া করে নিয়ে যায়। অতি ভয়ংকর নারকীয় শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হয়। তার সঙ্গে আত্মীয় স্বজনেরা কেউই যাবে না। তার যাতনার দৃশ্যও কেউ দেখতে যাবে না। যদিও সে সেই আত্মীয়-স্বজনদের জন্যই বহু স্নেহ-মমতা করেছিল, বহু কষ্ট করেছিল এবং তাদের জন্য পাপকর্মও করেছিল। তারপর সে বহু বর্ষ ব্যাপী নরকে যাতনাভোগের পর পৃথিবীতে এলেও অন্য লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে একই রকম ক্লেশকর অবস্থা প্রাপ্ত হতে থাকে।

পুনরায় তাকে কোনও মাতৃজঠরে অবস্থান করে কষ্ট পেতে হয়, তারপর কাঁদতে কাঁদতে ভূমিষ্ঠ হতে হয়। তারপর আবার সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। নিজের অতীতের অশেষ ক্লেশের কথাও সে ভুলে যায়। তার আগাম গতি কি, সে সম্বন্ধেও তার জানা থাকে না। তাই যারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি একান্ত উন্মুখ হয়ে থাকে, তারা পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করে ঠিক মতো চলতে পারে। দৃঢ়তা সহকারে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে তার প্রকৃত আলয় সচ্চিদানন্দময় জগতে উপনীত হতে পারে।

শ্রীপ্রহ্লাদ

প্রহ্লাদ যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করছিলেন, তখন মাতা কয়াদু ঘটনাক্রমে নারদমুনির আশ্রমে ভগবৎ কথা শ্রবণ করছিলেন। প্রহ্লাদের বিষ্ণুবিরোধী পিতা হিরণ্যকশিপু তখন কঠোর তপস্যায় ব্রতী ছিলেন। নারদমুনির ভাগবত শিক্ষা গ্রহণ করেই প্রহ্লাদ রাজপ্রাসাদে বাবা-মার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। শুক্রাচার্যের দুই পুত্র যণ্ড ও অমর্কের কাছে প্রহ্লাদকে পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়। শিক্ষকেরা রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি অনেককিছু শিক্ষাও দান করেছিলেন। কিন্তু এক সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করেন—

হে বৎস, তোমার শিক্ষকদের কাছে তুমি যে সমস্ত বিষয় পাঠ করেছ, তার মধ্যে কোন্ বিষয়টি তুমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করো, তা আমাকে বলো।

শিক্ষক যণ্ড ও অমর্ক ছিলেন প্রহ্লাদের পিতার কর্তৃক নিযুক্ত শৌক্র পরম্পরার গুরু। তাঁদের শিক্ষাগুলি ছিল একটি রাজপুত্ররূপে জাগতিক শিক্ষার বিষয়। যেগুলি প্রহ্লাদের কাছে কোনও আকর্ষণীয় ছিল না। শ্রীনারদের শিক্ষা প্রহ্লাদ গ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রহ্লাদ তাঁর উত্তরে বলতে লাগলেন—

সেই বিষয়টি শিক্ষা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ যাতে প্রত্যক্ষ ও পূর্ণরূপে নববিধা ভক্তির মাধ্যমে শ্রীহরির সেবা করা হয়। ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাসমূহ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, ভগবৎপাদপদ্ম সেবন, ষোড়শ উপচারে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভগবৎ বিগ্রহ অর্চনা, ভগবানের বন্দনা, তাঁর দাস হওয়া, তাঁকে প্রিয়তম বন্ধু বলে মনে করা এবং তাঁর কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা বা কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করা—

এইগুলি শুদ্ধভক্তির নয়টি পন্থা। এই ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, তিনি পূর্ণ জ্ঞানী।

যদিও এই কথায় অসুররাজ হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন তবুও প্রহ্লাদ বলতে লাগলেন—

অসংযত ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা নারকীয় জীবনে প্রবেশ করে একই বস্তু বার বার চর্বণ করে। সেই ধরনের দুর্বুদ্ধি থাকলে কখনও কোনও হিতোপদেশে, কিংবা নিজের বিবেকের বিচারেও কেউ কৃষ্ণভক্তি জিনিষটার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। তারা কেবল ভগবান সম্বন্ধে তাদের একটা জড় বদ্ধ বিকৃত ধারণা পোষণ করবে। যারা জড় সংসারটাকে ভোগ করার বাসনাতে আবদ্ধ হয়ে আছে, তারা তাদের মতো একটা বিষয়াসক্ত অন্ধ ব্যক্তিকে তাদের নেতা বা গুরুরূপে বরণ করছে। তারা বুঝতেই পারে না যে, দুর্লভ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া। অন্ধ যেমন অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধকূপে পতিত হয়, প্রকৃত পথের সন্ধান পায় না, তেমনই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা বিষয়ী গুরুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকাম কর্মরূপ অত্যন্ত শক্ত রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এভাবে জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্রে বারংবার আবর্তিত হয়ে ত্রিতাপদুঃখ ভোগ করতে থাকে। যে গুরু বা শিক্ষক নিজেই ভক্ত নয়, নিজেই জড়জগতের কলুষে কলুষিত সে কখনও কাউকে কৃষ্ণভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। শুদ্ধভক্তের চরণধূলিতে ভূষিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হতেও পারে না। যতদিন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হওয়া যায়, যতদিন পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে ব্রতী না হওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত জড়জগতের কলুষতা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

নাস্তিক অসুর হিরণ্যকশিপু নিজেকেই ভগবান বলে জাহির করেছিল, সে নির্মমভাবে প্রহ্লাদকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করলেও প্রহ্লাদ অবিচলিত ছিল। তারপর আবার প্রহ্লাদকে পাঠশালায় পাঠানো হয়। পাঠশালাতে অবসরকালে প্রহ্লাদ তাঁর সহপাঠীদের শিক্ষা দিতে লাগলেন—

এই মনুষ্য জন্ম বড় দুর্লভ। এই মনুষ্য-জীবনে যাঁরা প্রজ্ঞাবান বা বুদ্ধিমান তাঁরা বাল্যকাল থেকেই অন্য সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করে ভাগবতধর্ম অনুষ্ঠান করবেন। মানব শরীরটি অন্যান্য শরীরের মতো অনিত্য অর্থাৎ

ক্ষণস্থায়ী হলেও এই মনুষ্য শরীর অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। কারণ, মনুষ্য-জীবনে ভগবান শ্রীহরির সেবা সম্পাদন করা সম্ভব হয়। যে কেউ নিষ্ঠা সহকারে কিঞ্চিৎমাত্র ভগবদ্‌ভক্তির অনুশীলন করলেও পূর্ণসিদ্ধি লাভ করতে পারে। তোমরা জানবে যে, মনুষ্য-জীবন ভগবদ্‌ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করে। তাই প্রত্যেকটি মানুষের অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মসেবায় যুক্ত হওয়া। এই ভক্তি জীবের স্বাভাবিক কর্ম। কারণ পরমেশ্বর শ্রীহরি সকলেরই পরম প্রিয়, পরমাত্মা এবং পরম সুহৃদ্‌। হে বন্ধুরা, তোমরা জানবে যে, দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগ বশত যে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হয়, তা মনুষ্য-জীবনেই কেন যে কোনও জন্মেই পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে লাভ হয়ে থাকে। এই রকমের সুখ আপনা থেকেই কোনরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই লাভ হয়, ঠিক যেমন বিনা প্রচেষ্টায় দুঃখ লাভ হয়। তাই মনুষ্য-জীবনে একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তার ফলে ভগবানের নিত্যধামে নিত্যজীবনে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয়। যেকোনও জড় শরীর গ্রহণ করা মাত্রই সুখ-দুঃখ আসে। কিন্তু মনুষ্য শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ যদি কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যত্নশীল না হয়, কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণ ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য সময় ও শক্তির অপচয় করে তবে বাস্তবিক তাতে কোনও লাভ হয় না। যখনই তার মনুষ্য শরীরটি ত্যাগ হয়ে যাবে তারপরেই তাকে পরবর্তী জন্মে ইতর প্রাণীরূপে অধঃপতিত হতে হবে।

অতএব জড়জগতে অবস্থানকালে নিত্য শাশ্বত ও অনিত্য ক্ষণিকের পার্থক্য নিরূপণ করে যে পর্যন্ত এই সুন্দর মানব-শরীরটি রয়েছে, ততক্ষণ ভীত না হয়ে জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়াই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য। মানুষের আয়ুষ্কাল বড়জোর একশো বছর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের সেই একশো বছরের মধ্যে অর্ধেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয়। অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে দিনের অর্ধেক সময়টাই তারা ঘুমিয়ে থাকে। অতএব এই রকম ব্যক্তির আয়ুষ্কাল পঞ্চাশ বছর বলা যায়। বাল্যকালে অজ্ঞান অবস্থায় দশ বছর, কৈশোরে খেলাধুলায় দশ বছর, এভাবে কুড়ি বছর বিফলে যায়। বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত হয়ে কুড়ি বছর বৃথা অতিবাহিত হয়। বাকি সময়টি অসংযত ইন্দ্রিয় ও অতৃপ্ত কামনাবাসনা, প্রবল মোহগ্রস্ত হয়ে পারিবারিক ও অন্যান্য জাগতিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে থাকে। কৃষ্ণভক্তি কর্মে যুক্ত হওয়ার মতো তার কোনও সময় অবশেষ থাকে না।

মানুষ তার প্রিয় প্রাণকেও বিপন্ন করে অর্থ-উপার্জন করে পারিবারিক সম্বন্ধে মোহিত হয়ে। এভাবে সে কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, কিভাবে মনুষ্যজীবন পরম সত্যকে উপলব্ধি না করে অনর্থক হয়ে যাচ্ছে। অথচ বিষয়ী অর্থসংগ্রাহী ব্যক্তি অত্যন্ত বুদ্ধি খাটিয়ে সাবধানতার সঙ্গে দেখে যে, একটি পয়সাও যেন নষ্ট না হয়।

হে বন্ধুরা, কোন দেশে কোন কালে ভগবদ্‌ভক্তিজ্ঞানহীন ব্যক্তি নিজেকে জন্মমৃত্যুর দুঃখপূর্ণ বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি। বরং ভগবৎ বিমুখ হয়ে জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই জড় সংসারে বেশীর ভাগ লোকেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাদের জীবনের লক্ষ্য হলো, কি করে বেশী পরিমাণে যৌনসুখ ভোগ করবে। এভাবে পরিণামে অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকে পতিত হবে।

অনেকে মনে করে যে, ভোগের পরে তারা ত্যাগব্রত হয়ে সাধন ভজন করবে, কিন্তু দেখা যায় তারা পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েই ভজনবিমুখ হয়ে থাকে।

কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ—কারওই ভগবানের আরাধনা করতে কোনও বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক সর্বদাই বাস্তব এবং তাই অনায়াসে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়। তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে কর্মের সাক্ষী রূপে বিরাজমান। নাস্তিকেরা তাঁর অস্তিত্ব বুঝতে পারে না।

অতএব হে বন্ধুগণ, তোমরা শত্রুভাব বা দ্বৈতভাব রহিত হয়ে কর্ম করো। হরিভক্তির জ্ঞান প্রদান করে সমস্ত জীবের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শন করো। এভাবে তোমরা জগতের শুভাকাঙ্ক্ষী হও। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করা উচিত। প্রতিটি জীবকে তার স্থিতি অনুসারে সম্মান করা উচিত। এভাবে মানুষ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য জয় করে কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। নিরন্তর ভগবানের কথা স্মরণ করার ফলে ভক্তের মন ও শরীর জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময়ত্ব লাভ করে। কেউ যখন ভগবৎ সেবায় যুক্ত হয়, তখন তার জীবনের সমস্যা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রের গতি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। নিত্য দিব্য আনন্দ আস্বাদন করার সৌভাগ্য তার লাভ হয়।

শ্রীবলি মহারাজ

ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলি মহারাজ। ভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র বলি মহারাজ। তিনি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন। অন্যদিকে অদিতিদেবীর পুত্র ভগবান বামনদেব তাঁর ভাইদের তথা দেবতাদের হৃত রাজ্য ফিরিয়ে আনার জন্য দৈত্যরাজ বলির প্রাসাদে এসে যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মচারী রূপ ভগবান বামনদেবের তেজের প্রভাব লক্ষ্য করে, বলি মহারাজ আপন আসন থেকে উঠে এসে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করলেন। ভগবদ্ রূপমাধুরী দর্শনে অভিভূত হয়ে আনন্দিত চিত্তে তিনি ভগবানকে আসন প্রদান করলেন। স্বাগত বচনে অভিনন্দিত করে ভগবানের পাদপদ্ম প্রক্ষালন করে তাঁর অর্চনা করেছিলেন। সেই চরণধৌত জল রাজা বলি ভক্তিসহকারে নিজ মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

বলি মহারাজ বামনদেবকে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনাকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি। এখন দয়া করে বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি। আপনাকে দেখে বোধ হচ্ছে আপনি ব্রহ্মর্ষিদের সাক্ষাৎ মূর্তিমান তপোস্বরূপ। যেহেতু আপনি কৃপা করে আমাদের গৃহে উপস্থিত হয়েছেন, তাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা পরিতৃপ্ত হয়েছে, আমাদের বংশ পবিত্র হয়েছে এবং আমাদের এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। হে ব্রাহ্মণকুমার! শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আজ যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে এবং আমি আপনার পাদধৌত জলের দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। হে প্রভু, আপনার চরণকমলের স্পর্শে সারা পৃথিবী পবিত্র হয়েছে। হে ব্রাহ্মণকুমার! মনে হয়, আপনি যেন কোন কিছুর প্রার্থী হয়ে এখানে এসেছেন। অতএব আপনি যা কিছু চান তাই আমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। হে পূজ্যতম, আপনি আমার কাছ থেকে গাভী, স্বর্ণ, সুসজ্জিত গৃহ, সুস্বাদু আহার্য, পানীয়, ব্রাহ্মণকন্যা, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, রথ বা যা কিছু চান, তাই গ্রহণ করুন।

"মানুষ মারা গেলে তার এই জগতের সমস্ত সম্পদ তাকে পরিত্যাগ করে। অতএব যে যে সম্পদ মৃত্যুতে হারিয়ে যাবে, সেই সেই সম্পদ শ্রীহরির প্রসন্নবিধানের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত।" (শ্রীবলি মহারাজের উক্তি, শ্রীমদ্ভাগবত ৮/২০/৬)

তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু ।
সমত্বেন চ সর্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি ॥

"যিনি মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন, নীচজনের প্রতি কৃপা, সমান ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা এবং সর্বপ্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন, সর্বান্তর্যামী শ্রীভগবান সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন।" (শ্রীস্বায়ম্ভুব মনুর উক্তি, শ্রীমদ্ভাগবত ৪/১১/১৩)

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যু সমাকুলে ।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্থিতম্ ॥

"জন্ম-মৃত্যু এবং বিভিন্ন রকমের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সমন্বিত ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদ-সংকুল জড় সংসার থেকে মুক্ত হতে হলে একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকা। এ সত্য সর্বতত্ত্ববিদ্ স্বীকৃত।" (শ্রীব্রহ্মার উক্তি, স্কন্দপুরাণ)

এবং সর্বাসু বেলাসু অবেলাসু চ কেশবং ।
সম্পূজয়ন্নরো ভক্ত্যা সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
কিং পুনর্যোঽর্চয়েন্নিত্যং সর্বদেব-নমস্কৃতং ।
ধন্যঃ স কৃতকৃত্যশ্চ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

"সময়ে অসময়ে সবসময় যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণভাবে শ্রীহরির পূজা করতে থাকে, তার সর্বকামনা পূর্ণ হয়ে থাকে। অধিক আর কি কথা, সকল দেবদেবীর প্রণম্য শ্রীহরিকে যে মানুষ নিত্য অর্চনা করে, সে ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়ে বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করে থাকে।" (শ্রীশিবের উক্তি, স্কন্দপুরাণ)

মহাজন উক্তি

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ ॥

"ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তিযোগ, তা-ই মানব-সমাজে জীবের পরম ধর্ম।" (শ্রীযমরাজের উক্তি, শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/২২)

অথাপি তে দেব পদাম্বুজাদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

"বৈদিক শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ শ্রীভগবানের নাম, যশ, গুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্‌ভক্ত হন, তা হলে মহাপণ্ডিত না হলেও সে ভগবানকে জানতে পারে।" (শ্রীব্রহ্মার উক্তি, শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/২৯)

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

"এই মনুষ্য জীবন লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাল্যকাল থেকেই ভাগবত ধর্ম আচরণ করবে। মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। যদিও এই জীবন অনিত্য, তবুও এই জন্ম অর্থপূর্ণ। কারণ, ভগবদ্ ভক্তি অনুশীলন ফলে পূর্ণসিদ্ধি লাভ করা যায়।" (শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি, শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৬/১)

কলের্দোষনিধে রাজন্ অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

"হে রাজন্, যদিও কলিযুগ হচ্ছে এক দোষের সাগর, তবুও এই যুগে একটি মহান গুণ আছে। তা হল, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করার মাধ্যমে জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীব পরম চিন্ময় ধামে উন্নীত হতে পারবে।" (শ্রীশুকদেব গোস্বামীর উক্তি, শ্রীমদ্ভাগবত ১২/৩/৫১)

যে চ বেদবিদো বিপ্রা যে চাধ্যাত্মবিদো জনাঃ ।
তে বদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্মং সনাতনম্ ॥

"যিনি সঠিকভাবে বেদ অধ্যয়ন করেছেন, তিনি প্রকৃত বিপ্র বা বেদজ্ঞ। যিনি পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করাকেই জীবের সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা করেন।" (শ্রীভীষ্মদেবের উক্তি, মহাভারত)

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেন ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"সর্বপ্রকার কামনা যুক্ত হোন, অথবা সম্পূর্ণ নিষ্কাম হোন, অথবা মুক্তিকামী হোন, যিনি সুবুদ্ধিমান, তিনি তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন।" (শ্রীশুকদেবের উক্তি, ভাগবত ২/৩/১০)

ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্তয়ন্ ।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্মভিঃ ॥

"ভক্তি সমাহিত চিত্তে যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তিনি দেহত্যাগ কালে সকামকর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।" (শ্রীভীষ্মদেবের উক্তি, শ্রীমদ্ভাগবত ১/৯/২৩)

কিঙ্করা দণ্ডপাশৌ বা ন যমো ন চ যাতনাঃ ।
সমর্থাস্তস্য যস্যাত্মা কেশবালম্বনঃ সদা ॥

"যার হৃদয় সবসময়েই শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে রয়েছে, তার যম, যমদূত, যমদণ্ড, যমযাতনার ভয় নেই।" (শ্রীভীষ্মদেবের উক্তি, বিষ্ণুপুরাণ ৩/৮/৩৮)

যদ্ যদ্ হাস্যতি লোকেঽস্মিন্
সম্পরেতং ধনাদিকম্ ।
তস্য ত্যাগে নিমিত্তং কিং
বিপ্রস্তুয্যেন্ ন তেন চেৎ ॥

শ্রীশুকদেব

মহর্ষি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বললেন, যে দিন যেই ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী থেকে বৈকুণ্ঠে গমন করলেন, সেই দিন সেইক্ষণেই কলিযুগ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়েছে। এরপর দিব্য সহস্রবর্ষ অতীত হলে পৃথিবীতে পুনরায় সত্যযুগের প্রবর্তন হবে, তখন মানুষের মন স্বভাবতই আত্মপ্রকাশে সমর্থ হবে। মহারাজ শান্তনুর ভাই দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকু বংশজাত মরু—তারা দুজনে মহা যোগবলে বলীয়ান, এখন তারা কলাপ গ্রামে বাস করছেন, কলিযুগের শেষদিকে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে মানবসমাজে ফিরে আসবেন এবং পূর্বের মতো দিব্য বর্ণাশ্রম সমন্বিত সনাতন ধর্ম পুনঃপ্রবর্তন করবেন।

কত শত জড়বাদী মূর্খরা তাদের জড়দেহকেই 'আমি' এবং পৃথিবীকে 'আমার ভোগ্য বস্তু' বলে গ্রহণ করে, কিন্তু পরিণামে তারা সবকিছু ত্যাগ করে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আমি আপনার কাছে অনেক রাজা ও রাজনৈতিক নেতার কাহিনী বলেছি, কিন্তু সেগুলি পরমার্থযুক্ত নয়। সেগুলি জ্ঞানের যথার্থ বিষয়ই নয়।

মহাজন ব্যক্তিরা নিরন্তর সর্ববিঘ্নবিনাশন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণমহিমা কীর্তন করে থাকেন, আর শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধভক্তিকামী ব্যক্তি প্রতিদিনই অনুক্ষণ তা শ্রবণ করে থাকেন।

পরীক্ষিৎ বললেন, হে মুনিবর, চার যুগের মানুষের স্বভাব-চরিত্রের কথা বলুন।

শুকদেব বললেন—(১) সত্যযুগের মানুষেরা প্রায়ই আত্মতৃপ্ত, দয়াশীল, সবার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, প্রশান্ত, ধীর ও সহিষ্ণু। তারা আত্মারাম ও ধ্যানপরায়ণ। তারা সমদর্শী এবং তারা সর্বদাই পারমার্থিক পূর্ণতা লাভের জন্য যত্নশীল।

(২) ত্রেতাযুগের মানুষেরা যাগযজ্ঞপরায়ণ। এক চতুর্থাংশ মানুষ অধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। অধিকাংশ মানুষই বৈদিক আচার সম্মত ছিল। ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই বেশী।

(৩) দ্বাপর যুগে ধর্মের প্রভাব অর্ধেক হ্রাস পায়। চার বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দেরই প্রাধান্য বেশী। মানুষ যশলাভে উৎসাহী, বেদ অধ্যয়নশীল, সমৃদ্ধশালী, বহু কুটুম্ব সমন্বিত বিশাল পরিবারের ভরণপোষণে রত এবং প্রাণবন্ত উৎফুল্ল জীবন উপভোগ করে।

(৪) কলিযুগে ধর্মের এক চতুর্থাংশই শুধু অবশিষ্ট থাকে। নিত্য বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে অবশিষ্ট ভাগও হ্রাস পাবে এবং পরিণামে মনুষ্য সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। মানুষেরা প্রচণ্ড লোভী, দুরাচারী, নিষ্ঠুর, অনর্থক কলহপ্রবণ। অধিকাংশ মানুষই শূদ্র এবং বর্বরশ্রেণীর।

হে পরীক্ষিৎ, এই যুগগুলি কিভাবে মানুষের মনের মধ্যে পরিবর্তন আনে তা শ্রবণ করো। (১) যখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি দৃঢ়ভাবে সত্ত্বগুণে স্থিত হয়, অর্থাৎ পারমার্থিক জ্ঞান ও কর্ম অনুশীলন এবং নিয়মিত তপ অনুষ্ঠানে আনন্দ অনুভব করে, সেই সময়টি সত্যযুগ বলে বুঝতে হবে। (২) যখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি রজোগুণে স্থিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্তিগত যশলাভের উদ্দেশ্যে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে, সেই সময়টি ত্রেতাযুগ বলে বুঝতে হবে। (৩) যখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি তমো ও রজোগুণের মিশ্রণে স্থিত হয়, অর্থাৎ লোভ, অসন্তোষ, অহংকার, কপটতা ও ঈর্ষার প্রাধান্য পায় এবং সেই সঙ্গে স্বার্থপর কর্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন সেই সময়টি হচ্ছে দ্বাপর যুগ। (৪) যখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি তমোগুণে স্থিত হয়, অর্থাৎ প্রতারণা, মিথ্যাভাষণ, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয় ও দারিদ্র্য প্রাধান্য পায়, তখন সেই সময়টি কলিযুগ।

হে রাজন্, কলিযুগের মানুষের অবস্থা শ্রবণ করো। মানুষের মন সর্বদাই উত্তেজিত থাকবে। দুর্ভিক্ষ ও করপীড়িত হয়ে তারা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। সর্বদা অনাবৃষ্টির ভয়ে উদ্বিগ্ন হবে। পর্যাপ্ত অন্ন, বস্ত্র ও পানীয়ের অভাব হবে। তারা উপযুক্ত বিশ্রাম, কাম উপভোগ কিংবা স্নান করতে অক্ষম হবে। তাদের গায়ে অলংকার থাকবে না। ক্রমে ক্রমে কলির

চক্রের মতো পরিবর্তিত হচ্ছে। বুদ্ধিমান লোক তাঁকেই অবিনাশী অব্যক্ত ও নিত্য বলে কীর্তন করে থাকেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ থেকেই পিতৃ, দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসুর ও মানুষদের সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণই যুগপ্রারম্ভে বেদশাস্ত্র, শাশ্বত লোকধর্ম ও প্রকৃতির সৃষ্টি করে থাকেন। সমস্ত শাস্ত্রের মূল জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণঃ পাদপদ্ম লাভই পরম গতি।

দ্রৌপদীদেবী যখন রাজসভামধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসনাদির দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছিলেন তখন দ্রৌপদীর প্রশ্ন ছিল, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর পত্নীকে বাজী রেখে খেলা করেছেন, খেলায় পরাজিত হওয়ার আগে না পরে? দুরাত্মা দ্যূতপ্রিয়দের কপট খেলায় কুরুপাণ্ডবাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির কিভাবে প্ররোচিত হয়ে মূঢ়দের দ্বারা পরাজিত হয়েছেন, তা তিনি নিজে বুঝতে পেরেছেন। এই সভামধ্যে অনেক কুরুবংশীয় ব্যক্তি বিরাজ করছেন, যাঁরা পুত্র ও পুত্রবধূগণের প্রভু ও পরিচালক। তাঁদের কাছ থেকে আমার প্রশ্নের উত্তর চাই যে, সভামধ্যে ধর্মতঃ এই নির্লজ্জদের দ্বারা আমার লাঞ্ছিত হওয়া আবশ্যক কিনা?

তখন বয়োজ্যেষ্ঠ ভীষ্মদেব মর্মাহত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, হে সুভগে! এদিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখতে পারে না। ওদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন। এই উভয় পক্ষই তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বিবেচনায় অসমর্থ হয়েছি। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ধর্মের জন্য সমগ্র পৃথিবী পরিত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু ধর্ম থেকে এক পাও বিচলিত হতে পারেন না। বিশেষত তিনি নিজমুখে স্বীকার করেছেন, 'আমি পরাজিত হয়েছি, তাই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।' শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় দক্ষ। যুধিষ্ঠির তার সঙ্গে ক্রীড়া করতে অভিলাষী, তিনি স্বয়ং তোমার অবমাননা উপেক্ষা করে রয়েছেন, সেই জন্য আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি না।"

দ্রৌপদী বললেন, আমি ধর্মপরায়ণা কুলবধূ। আমাকে এই সভামধ্যে নির্যাতন করতে আনা হল, এখন আপনাদের মতো পরিচালকদের সনাতন

ধর্ম কোথায় থাকল? আমি পাণ্ডবদের সহধর্মিনী, পার্ষতের ভগ্নী, কৃষ্ণের প্রিয়সখী দ্রৌপদী। আমাকে যখন একবস্ত্রা অবস্থায় সভামধ্যে লাঞ্ছিত করতে আনা হয়েছে, তা হলে অবশ্যই এই কুরুবংশের পূর্বপুরুষদের পরম্পরাগত নিত্যধর্ম বিনষ্ট হল। হে ক্ষিতিপালগণ আমার প্রশ্ন, আমি যা হই, আপনাদের নিত্যধর্ম কোথায়? উত্তর দিন।

ভীষ্মদেব বললেন, কল্যাণি! সেই ধর্ম আজ অভিভূত হয়ে অধর্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কৌরবরা আজ লোভ ও মোহের বশীভূত। অতএব এটিই পরিষ্কার বোধ হচ্ছে যে, অচিরেই কুরুবংশ বিলুপ্ত হবে। দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য আদি ধর্মবেত্তাগণও অভিভূত হয়ে চুপ রয়েছেন, তোমার প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, তিনিই বলুন, তুমি জিতা না অজিতা।

সেই দ্রৌপদী যখন একদিন শরশয্যায় শায়িত সদুপদেশদাতা সত্যবাদী ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ধর্মপ্রাণ পিতামহ, আজ আপনি আমাদের ধর্ম উপদেশ দান করছেন, কিন্তু আমাকে যেদিন অন্যায়ভাবে বস্ত্রহরণ করছিল দুঃশাসনেরা, তখন আপনি প্রতিবাদ করেননি কেন?

উত্তরে ভীষ্মদেব বলেন, হে পাঞ্চালী, দুরাত্মা দুর্যোধনের অন্নে পালিত হয়ে আমি কলুষিত হয়ে পড়েছিলাম। সেজন্য আমি কোনও কথা বলতে পারছিলাম না। রণাঙ্গনে অর্জুনের শরাঘাতে আমার শরীর থেকে সেই কলুষিত রক্ত নিঃসৃত হয়ে গেছে, তাই আজ আমি ধর্ম উপদেশ দিচ্ছি। বিষয়ী, ভোগাকাঙ্ক্ষীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়। জগতে সাধুব্যক্তির সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজন।

(৩) বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা—বৈদিক শাস্ত্র কথা শ্রবণ করলে, আমরা নিজেদের সংশোধন করতেও পারি, কিন্তু বৈদিক হিতোপদেশের প্রতি অনীহা বা অশ্রদ্ধা মনোভাব পোষণ করা।

হে যুধিষ্ঠির, এই তিন রকমের পাপ পরিত্যাগ করলে, কি ইহলোকে কি পরলোকে শ্রেয়ো লাভ হয়। অন্যথায় পাপকর্মফলে উভয়লোকে অশুভ পরিস্থিতি যাতনাকষ্ট ভোগ করতে হয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ইহলোকে মাংসলোলুপ নৃশংস ব্যক্তিরা রাক্ষসের মতো। তারা ভগবৎ নির্দিষ্ট কেবল শাকসবজি ফলমূল বা ঘৃত শর্করা ইত্যাদি সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রতি প্রীত হয় না।

ভীষ্মদেব বললেন, ধর্মরাজ, যে ব্যক্তি অন্যের মাংস দ্বারা নিজ মাংস বর্ধিত করতে চায়, সে নিষ্ঠুর। মানুষের নিজের মতো অন্যের প্রিয় প্রাণ সংহার করতে কখনও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। শুক্র থেকে মাংস উৎপন্ন হয়, সেই মাংস ভক্ষণ করা নির্ঘৃণের কর্ম। বৈদিক যজ্ঞবিধান অনুসারে মাংস ভক্ষণে দোষ ছিল না, কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই হিংসাকর্ম।

মৃত্যু সমস্ত প্রাণীরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সবারই শরীর কম্পিত হয়। এই সংসার মধ্যে প্রাণীরা জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়। পরিশেষে আবার মৃত্যু এসে তাদেরকে যারপরনাই যাতনা প্রদান করে থাকে। যারা মাংস ভক্ষণ করছে, তারা—

(১) প্রথমে কুম্ভীপাক নামক নরককুণ্ডে যাতনা ভোগ করবে।

(২) তারপর তির্যক্ জাতির গর্ভে অবস্থান করবে এবং ক্ষার, অম্ল, কটু রস এবং মূত্র, শ্লেষ্মা ও মল দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হবে।

(৩) তারপর ভূমিষ্ঠ হয়ে অন্যের বশীভূত হবে এবং ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে হবে।

(৪) বারংবার অন্যদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হতে হবে।

যে দুরাত্মা জীবিতপ্রিয় জীব-জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে, তারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত জীবজন্তু কর্তৃক আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নেই। যারা

পশু হত্যা করে, পরজন্মে তারা আগে এবং যারা সেই পশুর মাংস খায়, তারা তার পরেই সেই একই পশু কর্তৃক বিনষ্ট হয়ে থাকে।

এই জীবনে যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাকে পরজীবনে অন্য কর্তৃক আক্রুষ্ট হতে হয়। এই জীবনে যে অন্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তাকে তার দ্বারা দ্বিষ্ট হতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্য করে, তাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্যের ফল ভোগ করতে হয়, সন্দেহ নেই। ফলতঃ অহিংসাই মানুষের পরম ধর্ম, পরম দান, পরম তপস্যা, পরম জ্ঞান। অহিংসক ব্যক্তিরা সবার পিতামাতা স্বরূপ।

যারা পরের প্রতি বিদ্রোহাচরণ প্রভৃতি অসৎ কর্ম করে, তারা পাপী বলে নির্দিষ্ট হয়। পাপাচারী ব্যক্তি পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই—এই মনে করে।

যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্ন করলেন, হে পিতামহ, কোন্‌টি ধর্ম, কোন্‌টি অধর্ম—তা ক্ষেত্র বিশেষে বুঝে ওঠা অত্যন্ত দায় হয়ে পড়ে। আপনি বলুন, যথার্থ ধর্ম জ্ঞানে কার নির্দেশ মেনে চলব? বা কি করব?

উত্তরে ভীষ্মদেব বলেন, হে যুধিষ্ঠির মহারাজ, বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে নির্দেশ দিচ্ছেন সেই নির্দেশমতো চলাটাই একমাত্র ধর্ম। যিনি সঠিকভাবে বেদ অধ্যয়ন করেছেন, যিনি পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করাকেই জীবের সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা করেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে পিতামহ, লোকে মোক্ষলাভই চরম পুরুষার্থ বলে। তাই আপনি উৎকৃষ্ট মোক্ষলাভের বিষয়টি দয়া করে বলুন।

ভীষ্মদেব বললেন, চার বেদেরও গুহ্য ও সর্বশাস্ত্রসার সেই মোক্ষযোগের কথা বলছি, মন দিয়ে শ্রবণ করো। এই বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিশ্বসংসার ও বেদের আদি। তিনিই সনাতন পুরুষ, তিনিই সত্য, জ্ঞান, তিতিক্ষা, যজ্ঞ ও সরলতা স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই শাশ্বত পরমব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ কালচক্র, অনাদি ও অনন্ত। এই ত্রিলোক তাঁর মধ্যেই

জরা-ব্যাধি কেউই চায় না, তবুও সেগুলি অবশ্যম্ভাবী রূপে আসে। তা সত্ত্বেও মূর্খতা বশত মানুষ মনে করে যে, সে বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা করে এই জড়জগতে সুখী হতে পারবে।

লোকে সুখ চায়। সুখ পাওয়ার জন্য তার চেষ্টা বা কর্ম—সেটা দুঃখময়। সুখভোগের মধ্যেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কথা স্মরণ হয়। সুখভোগের পরেও অবসাদ ও বিষণ্ণতা আসে। বুদ্ধিমান মানুষ যদি প্রকৃত দুঃখনিবৃত্তি লাভ করতে চায়, প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে চায়, যদি সব রকমের কুণ্ঠামুক্ত হতে চায়, তবে অবশ্যই তাকে বৈকুণ্ঠ জগতের বাসিন্দা হতে হবে।

তাই এই জড়জগতে থাকাকালীন নির্বিকারে তার আপন কর্তব্য সম্পাদন করে চলতে হয়, কারও প্রতি হিংসা বা বিরূপভাব প্রকাশ না করে, লোক শিক্ষা হেতু জাগতিক ধর্ম অনুষ্ঠান করে চলতে হয়। সর্বোপরি তাকে শ্রীহরির শরণাগত হয়ে চলতে হয়। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য শ্রীহরির আরাধনা করা।

শ্রীভীষ্মদেব

ভীষ্মদেবকে যুধিষ্ঠির বললেন, হে পিতামহ! লোকে কিরকম আচার সম্পন্ন হয়ে ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়ো লাভ করতে পারে, তা আমার কাছে বলুন।

গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেব বললেন, বৎস! কায়-মনো-বাক্যে পাপাচার পরিত্যাগ করলে মানুষ উভয়লোকে শ্রেয়ো লাভ করতে পারে।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, কায়-মনো-বাক্যে পাপাচার কি রকম?

ভীষ্মদেব বললেন, তিন রকমের পাপ—(১) কায়িক পাপ, (২) বাচিক পাপ ও (৩) মানসিক পাপ।

১। কায়িক বা শারীরিক পাপ তিন রকমের—

(১) **পরহিংসা**—জীবহত্যা, অপরের শরীরে আঘাত করা, শারীরিকভাবে নিপীড়ন করা।

(২) **চৌর্য**—অন্যের দ্রব্য চুরি করা।

(৩) **পরস্ত্রী উপভোগ**—পরনারী হরণ, পরস্ত্রীসঙ্গ, বেশ্যালয় গমন।

২। বাচিক পাপ চার রকমের—

(১) **অসৎ প্রলাপ**—গ্রাম্য কথা, সাংসারিক গল্প করা।

(২) **নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ**—অন্যের প্রতি মর্মদাহী বাক্য নিক্ষেপ করা।

(৩) **পরদোষ প্রকাশ**—অন্যের গুণ না দেখে দোষগুলিকেই কীর্তন করা।

(৪) **মিথ্যা কথন**—সত্যকে গোপন রেখে মিথ্যাটাকেই সত্য বলে ঘোষণা করা।

৩। মানসিক পাপ তিন রকমের—

(১) **পরদ্রব্য অভিলাষ**—যা নিজের নয়, পরের বলে জানি, সেটিই পাওয়ার ইচ্ছা।

(২) **পরের অনিষ্ট চিন্তা**—লোকের মঙ্গল চিন্তা না করে, লোকের কি করে ক্ষতি হয়, সেই চিন্তা করা।

ভগবান তেমন ঘোষণা করলেন, এই বলি মহারাজ আমার উদ্দেশ্যে তার সমস্ত ধন সম্পদ হারালো, উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হল, শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়ে বন্দী হল, আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হল, বন্ধনের দ্বারা নিপীড়িত হল, গুরুর দ্বারা তিরস্কৃত হল, অভিশপ্ত হল, তবুও সে তার প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত ছিল এবং সত্যভ্রষ্ট হয়নি। তার মহান সহনশক্তির ফলে আমি তাকে দেবতাদেরও দুর্লভ স্থান দান করব। সাবর্ণি মন্বন্তরে তাকে দেবলোকের ইন্দ্রপদ দান করব। সেই ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বকর্মা নির্মিত সুখকর স্থান সুতললোকে বলিরাজা বাস করবে। সেই স্থান বিশেষত আমার দ্বারা সংরক্ষিত, সেখানে মানসিক ক্লেশ, দৈহিক ক্লেশ, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাজয় প্রভৃতি কোনও উপদ্রব নেই। হে বলি মহারাজ, তোমার আত্মীয়বর্গ সহ শান্তিতে সেখানে বাস করো। আমিও সেখানে তোমার সঙ্গে থাকব, তোমার পার্ষদ ও তোমার সমস্ত সম্পদসহ সেখানে তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব। তুমি সেখানে আমাকে সর্বদাই দর্শন করতে পারবে। আমার প্রভাব দেখে এবং দৈত্য-দানবদের সঙ্গ প্রভাবে তোমার যে জড় ধারণা এবং উৎকণ্ঠার উদয় হয়েছে, সেই সমস্ত উৎকণ্ঠাও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

যদিও দেবতাদের হৃত রাজ্য বামনদেব এনে দিলেন। কিন্তু মহাত্মা বলি মহারাজ দেবতাদের অপেক্ষা অনেক গুণ উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করলেন।

বলি মহারাজ ভক্তিব্যাকুল চিত্তে সাশ্রু নয়নে গদগদ বাক্যে বলতে লাগলেন—হে ভগবান, আমি কেবল আপনাকে প্রণাম করতে চেষ্টা করেছিলাম। এই অধঃপতিত দৈত্যের প্রতি আপনি যে অহৈতুকী কৃপা করেছেন, তা দেবতা বা লোকপালেরাও কখনও লাভ করতে পারেননি। আপনাকে আমার শতকোটি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

শ্রীজনক

জনক রাজাও ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী, তাই বেদের নির্দেশ অনুসারে নানারকম যাগ-যজ্ঞ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা তাঁর ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোক শিক্ষার জন্য তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করতেন। জনক রাজা ছিলেন সীতাদেবীর পিতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর অর্থাৎ তিনি ছিলেন ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। কিন্তু তা বলে তাঁর রাজকার্যে তিনি কোন রকম অবহেলা করেননি। শাস্ত্রানুযায়ী কর্তব্যকর্ম কিভাবে পালন করতে হয়, তা তিনি প্রজাদের শেখাতেন।

রাজর্ষি জনক তাঁর প্রজাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন—

এই জগৎ দুঃখ দিয়ে গড়া। যে এখানে জন্মগ্রহণ করবে তাকে দুঃখ পেতে হবে। মায়া-মোহের বশে হোক, কর্তব্যবোধে হোক, দুঃখ বরণ করতে হয়। দুঃখ সইতে হয়।

তিন রকমের দুঃখ আছে—

১। আধ্যাত্মিক দুঃখ—(১) দৈহিক দুঃখ—যে শরীরটি এই জড়জগতে আমরা ধারণ করেছি, এটি মাতৃজঠর থেকেই নানা দুঃখের কারণ হয়। দেহটি ব্যাধিগ্রস্ত হয়, জরাজীর্ণ হয়। (২) মানসিক দুঃখ—প্রিয় বিয়োগে, অপ্রিয় সংযোগে শোক দুঃখ পেতে হয়। যা আমরা চাই তা পাই না, যা চাই না তাই পেয়ে দুঃখ অনুভব করি।

২। আধিভৌতিক দুঃখ—জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। দুর্বৃত্ত মানুষেরা অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। আমি কারো কোনও ক্ষতি করবার চেষ্টা না করলেও অন্য কেউ আমাকে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে।

৩। আধিদৈবিক দুঃখ—বন্যা, ভূকম্প, ঝড় দুর্ভিক্ষ খরা বাদলা ইত্যাদি দুঃখ যা বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা সংঘটিত হয়।

এই জগতের বাসিন্দা হিসাবে প্রত্যেককেই কমবেশী এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়। যতদিন পর্যন্ত কেউ বৈকুণ্ঠজগতে উন্নীত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই দুঃখকষ্ট তাকে বহন করতে হয়। দুঃখময় জন্ম-মৃত্যু-

হে মুনিবর, বেদ বিহিত যজ্ঞ কর্মে নিপুণ আপনার মতো মহাত্মারা সর্ব অবস্থাতেই ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেন। তাই সেই শ্রীহরি আমাকে সমস্ত বর দান করবার জন্যই আসুন কিংবা শত্রুরূপে দণ্ডদান করবার জন্যই আসুন, আমার কর্তব্য হচ্ছে তাঁর আদেশ পালন করে তাঁর অনুজ্ঞা অনুসারে তাঁকে তাঁর প্রার্থিত ভূমি দান করা। তিনি সংহার করুন কিংবা রক্ষা করুন, সর্ব পরিস্থিতিতে সর্ব অবস্থাতেই শ্রীহরির আরাধনা কর্তব্য বলেই জানি।

হে গুরুদেব, এও তো সত্য যে, আমি তাঁকে কিছু দিতে চাই আর না চাই, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি আমার কাছে নিতে এসেছেন, অতএব যেকোনও প্রকারেই হোক নিবেনই।

গুরু শুক্রাচার্য দেখলেন তাঁর শিষ্য বলি গুরুবাক্য লংঘন করছে, অমনি অভিশাপ দিলেন—হে উদ্ধত, তুমি নিজেকে বড় পণ্ডিত বলে মনে করে আমার আদেশ লংঘন করছ, তাই অচিরেই তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হবে।

গুরুর দ্বারা অভিশপ্ত বলি মহারাজ তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে মোটেই বিচলিত হলেন না। তিনি বামনদেবকে ভূমি দান করলেন। বামনদেবের চরণ প্রক্ষালনের জন্য স্বর্ণকলসীতে জল আনলেন বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী। বলি মহারাজ ভগবানের পাদধৌত করে সেই চরণামৃত পান করলেন। স্বর্গের সমস্ত দেবদেবী বলি মহারাজের উপর পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন।

বামনদেব পাদ প্রসারণ করে এক বিরাটরূপ ধারণ করলেন, এভাবে ত্রিলোক অধিকার করলেন।

বলি মহারাজের অনুচর দৈত্যরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, এই ব্রাহ্মণবেশী মায়াবী বিষ্ণু ছল করে সত্যবাদী বলি মহারাজের সর্বস্ব হরণ করছে অতএব আমাদের উচিত বিষ্ণুকে বধ করা। তখন তারা অস্ত্রাদি ধারণ করে বধ করতে ধাবিত হল। তখন বিষ্ণুর অনুচরেরা হাসতে হাসতে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অসুর সৈন্যরাই নিহত হতে লাগল।

সেই অবস্থা লক্ষ্য করে বলি মহারাজ শুক্রাচার্যের অভিশাপ স্মরণ করে বললেন, হে রাহু, হে নেমি, তোমরা আমার কথা শোনো। যুদ্ধ বন্ধ করো। কারণ বর্তমান কাল আমাদের অনুকূল নয়। হে দৈত্যগণ, তোমরা ভালভাবে শোনো, যিনি সমস্ত জীবের সুখ ও দুঃখ প্রদান করেন, সেই ভগবানকে কখনও কেউই তার পৌরুষের দ্বারা পরাস্ত করতে পারে না। কাল হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধি। আগে সেই কাল আমাদের অনুকূলে ছিলেন এবং দেবতাদের প্রতিকূলে ছিলেন, সেই কাল এখন আমাদের বিপরীত হয়েছেন। যে কোনও জীবই বলের দ্বারা, মন্ত্রীদের পরামর্শ দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, রাজনীতির দ্বারা, দুর্গের দ্বারা, মন্ত্রের দ্বারা, ঔষধের দ্বারা কিংবা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা ভগবানের প্রতিনিধি কালকে অতিক্রম করতে পারে না। দৈববলে তোমরা বলীয়ান হয়ে বিষ্ণুর অনেক অনুচরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছ। আজ দৈববলে তারাই আমাদের পরাজিত করছে। অতএব ধৈর্য ধরে কালপ্রতীক্ষা করো।

এদিকে বামনদেব বলতে লাগলেন, হে দৈত্যরাজ, ত্রিপাদ ভূমি দানের প্রতিশ্রুতি দিলে। দুই পদেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করেছি, এখন তৃতীয় পদ কোথায় রাখবো। তা তুমি স্থির করো।

বলি মহারাজ বললেন, হে ভগবান, আপনি যদি মনে করেন যে, আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়েছে, তা হলে আমি তা অবশ্যই সংশোধন করে সত্যে পরিণত করব। দয়া করে আপনি আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ প্রদান করুন।

হে ভগবান, অসীম জ্ঞান সম্পন্ন আমার পূজনীয় পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতা ও বন্ধুবান্ধবদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার পাদপদ্মকে একমাত্র আশ্রয় জেনে আপনার শরণাগত হয়েছিলেন। দৈববশত আমি আজ আপনার শ্রীপাদপদ্মের সমীপে নীত হয়েছি। অনিত্য ঐশ্বর্যের প্রতি মোহবশত মরণশীল জীব বুঝতেই পারে না যে, তার জীবন নশ্বর। কিন্তু আমি ভাগ্যবশত সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভ করেছি।

হিতকর হবে না, বরং দৈত্যদের অত্যন্ত অনিষ্ট হবে। এই কপট ব্রহ্মচারী-বেশধারী ব্যক্তি হচ্ছেন শ্রীহরি। যিনি তোমার রাজ্য, তোমার স্ত্রী, তোমার তেজ, তোমার যশ, তোমার জ্ঞান সবকিছুই হরণ করার জন্য এখানে এসেছে। তোমার সর্বস্ব অপহরণ করে এই ব্রহ্মচারী তোমার শত্রু ইন্দ্রকেই সেইসব দান করবে। হে মূঢ়, তোমার বোঝা উচিত, ত্রিপাদভূমি গ্রহণের ছলে ত্রিভুবন সে নিয়ে নেবে। তখন তুমি জীবিকা নির্বাহ করবে কিভাবে? এক পদবিক্ষেপে এই বামনদেব পৃথিবী, দ্বিতীয় পদবিক্ষেপে স্বর্গ সহ সমগ্র অন্তরীক্ষ অধিকার করবেন, তখন তৃতীয় পদবিক্ষেপের স্থান কোথায় হবে? অতএব তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালনে নিশ্চয়ই অসমর্থ হবে, এজন্য নিশ্চয়ই তোমার নরকে স্থিতি হবে। যে দানে নিজের জীবিকা পর্যন্ত বিপন্ন হয়, পণ্ডিতেরা সেই দানের প্রশংসা করেন না। সমস্ত দান, যজ্ঞ, তপস্যা, কর্ম অনুষ্ঠান করা কেবল তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাঁরা যথাযথভাবে তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে পারে। যারা নিজেদের ভরণ পোষণ করতে পারে না, তাদের পক্ষে এসব কাজ সম্ভব নয়। জ্ঞানবান ব্যক্তি তাঁর বিত্তকে পাঁচ ভাগ করেন। ধর্মের জন্য একভাগ, যশের জন্য একভাগ, ঐশ্বর্যের জন্য একভাগ, ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য একভাগ, আত্মীয় কুটুম্ব পালনের জন্য একভাগ। এভাবে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, বর্তমানে মানুষ তাদের সমস্ত ধন পরিবারের সুখবিধানের জন্য ব্যয় করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা শিখিয়েছেন, সঞ্চিত ধনের অর্ধেক কৃষ্ণসেবার জন্য, বাকি অর্ধেক নিজে ও পরিবারের জন্য ব্যবহার করা কর্তব্য। কেননা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা। বাকি অর্ধেক ধন নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যবহার করা উচিত যেহেতু তারা তা আশা করে থাকে।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বললেন, জল স্পর্শ করে 'কিছুই দান করব না' এই বাক্য উচ্চারণ করাই যথার্থ হবে। এতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধ নেই, কেননা সাতটি বিষয়ে মিথ্যা কথা নিন্দনীয় নয়—

(১) নিজস্ত্রীকে বশীভূত করতে, (২) পরিহাস করার ক্ষেত্রে, (৩) বিবাহকালে, (৪) জীবিকা অর্জনে, (৫) জীবন বিপন্ন হলে, (৬) গাভী ও ব্রাহ্মণের হিতার্থে, (৭) শত্রুর হাত থেকে কাউকে রক্ষা করার কালে।

কুলগুরু শুক্রাচার্যের উপদেশ পেয়ে বলি মহারাজ ক্ষণকাল মৌন থেকে গুরুদেবকে বললেন,—আপনি আগেই শিখিয়েছেন যে, যে ধর্ম—অর্থ রোজগার, ইন্দ্রিয় সুখভোগ, যশ ও জীবিকায় বাধা সৃষ্টি করে না, তাই গৃহস্থদের প্রকৃত ধর্ম। আমিও তা সত্য বলে জানি। আমি প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র, কখনও ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি না। প্রবঞ্চনা করা ঠিক নয় এবং অসত্য থেকে গুরুতর অধর্ম আর কিছুই নেই। মা বসুন্ধরা বলেছিলেন, "আমি মিথ্যাবাদী মানুষ ব্যতীত অন্য যেকোনও ভার বহন করতে পারি।" নরক দারিদ্র্য মৃত্যু কোনও কিছুকে আমি ভয় পাই না, কিন্তু ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করতে ভয় পাই। আমার মৃত্যু একদিন অনিবার্য। এই জগতের সমস্ত সম্পদ তখন আমাকে পরিত্যাগ করবে। তাই এখন জীবৎকালে সেই সম্পদ দিয়ে বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান হলেই জীবন ধন্য বলে মনে করব। দধীচি, শিবি প্রমুখ মহাত্মারা ভগবানের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। আর আমার এই সামান্য ভূমি পরিত্যাগ ব্যাপারে এত চিন্তা, বিচার বিবেচনা করার কি আছে?

যত কিছু আমরা আঁকড়িয়ে থাকি না কেন, কালের নিয়মে সবকিছু ফেলে যেতেই হয়। বড় বড় দৈত্যরা পৃথিবীতে আধিপত্য করেছিল, কাল তাদের সব কিছু হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু তাদের যশোরাশি কেউ হরণ করেনি। তাই যশ লাভের চেষ্টা করা উচিত। বহু ক্ষত্রিয় দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দান করেছে। কিন্তু সমস্ত সঞ্চিত ধন সম্পদ পরমেশ্বর-ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করার সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়ে থাকে।

লোকে কতশত রকমের পাপ কর্মফলে ধনসম্পদ হারিয়ে দারিদ্রগ্রস্ত হয়, কেউ তার প্রশংসা করে না। কিন্তু তার সম্পদ যখন যথার্থ যোগ্যপাত্রে দান করে, তাতে সে নিঃস্ব হলেও তার মহিমা কীর্তিত হয়।

শ্রীবামনদেব বললেন, হে রাজন্, আপনি যথার্থই মহান, কারণ ঐহিক বিষয়ে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা আপনার উপদেষ্টা। পারলৌকিক কর্মে অর্থাৎ ভগবদ্ধাম প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ নিত্য কর্মে আপনার শান্তপ্রকৃতির পিতামহ কুলবৃদ্ধ প্রহ্লাদ মহারাজ আপনার উপদেষ্টা। আপনার বাক্য অতি সত্য এবং ধর্মনীতির অনুকূল। আমার প্রতি আপনার এরূপ আচরণ আপনার বংশের উপযুক্ত এবং তা আপনার যশ বৃদ্ধি করবে।

হে রাজন্, আমি জানি যে, এখনও পর্যন্ত আপনার বংশে কোনও সংকীর্ণমনা অথবা কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি যিনি যাচক ব্রাহ্মণদের প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা এমন কেউ জন্মাননি যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে দান করেননি। এমন কেউ জন্মাননি যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনার বংশ বিশেষভাবে যশস্বী হয়েছে পরম ভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজের উপস্থিতির ফলে। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন মহারাজ। আপনার পিতা বিরোচন মহারাজও অত্যন্ত ব্রাহ্মণবৎসল। ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবতাদেরকে জেনেও তিনি তাঁদের প্রার্থনায় তাঁর আয়ু তাদেরকে দান করেছিলেন। হে দৈত্যরাজ, আপনার পূর্বপুরুষ মহাবীরেরা বিশাল কীর্তিমান ছিলেন, আপনিও তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। আপনি অনেক কিছু আমাকে উদারভাবে দান করতে সমর্থ। কিন্তু আমি মাত্র আমার পা রাখার মতো পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাইছি। যদিও আপনি অত্যন্ত উদার এবং আমিও যত ইচ্ছা ভূমি চাইতে পারি। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাওয়া ব্রাহ্মণের উচিত নয়। বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি কেবল তার প্রয়োজন অনুসারেই অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে, তা হলে তার পাপ হয় না।

বলি মহারাজ বললেন—হে ব্রাহ্মণকুমার তোমার উপদেশ বিজ্ঞ বৃদ্ধদের মতো। কিন্তু তুমি বালক অপরিণত বুদ্ধি। আমার কাছে কিছু চাইতে এসে তোমার মধুর বাক্যে আমাকে তুষ্ট করে কেবল ত্রিপাদ ভূমি চাইছ, তুমি জানবে অন্তরীক্ষের সমস্ত গ্রহলোক আমার অধিকারে রয়েছে।

অনায়াসে আমি তোমাকে একটি সমগ্র দ্বীপ দিতে পারি। হে বালক, তুমি জানবে আমার কাছে যে একবার ভিক্ষা করতে আসে, তাকে আর অন্য কোথাও ভিক্ষা করতে হয় না। তাই তোমার জীবিকা নির্বাহের যোগ্য প্রচুর ভূমি গ্রহণ করো।

শ্রীবামনদেব বললেন—হে রাজন, ত্রিভুবনের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের যত বস্তু থাক, সেগুলি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে না। ত্রিপাদ ভূমিতে যদি তুষ্ট না হই তবে নয়টি বর্ষ সমন্বিত এক দ্বীপ লাভ করে তুষ্ট হব না। তখন সপ্তদ্বীপ লাভের ইচ্ছা হবে। পৃথু, গয় প্রভৃতি অতি পরাক্রমশালী রাজারা সপ্ত দ্বীপের আধিপত্য লাভ করেও তাঁদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয়নি। প্রারব্ধ কর্মফলে যা লাভ হয় তা নিয়েই তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ অসন্তোষ কখনও সুখ দিতে পারে না। কামনাবাসনা ও অর্থলিপ্সা অসন্তোষের কারণ। এই অসন্তোষই সংসার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কারণ। সংসার থেকে মুক্ত হতে হলে ভগবানের ইচ্ছায় যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের পারমার্থিক শক্তি বিনষ্ট হয়। যেমন জল ঢাললে আগুনের তেজ বিনষ্ট হয়। তাই হে দাতাশ্রেষ্ঠ, কেবল আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দিন। তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব। প্রয়োজনমতো বিত্তই সংসারে সুখ প্রদান করে।

বলি মহারাজ প্রীত হয়ে বললেন—'বেশ, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই গ্রহণ করো'। এই বলে তাঁকে ভূমি দান করার জন্য সংকল্প করতে জলপাত্র গ্রহণ করলেন।

সেই সময় বলি মহারাজকে বাধা দিয়ে কুলগুরু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বললেন, হে বিরোচনপুত্র, এই বামনরূপী ব্রহ্মচারী সাক্ষাৎ বিষ্ণু, ইনি অদিতি ও কশ্যপের পুত্ররূপে দেবতাদের কার্য-সাধন করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁকে ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তাই তুমি ভয়ংকর পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছ, তা তুমি জানো না। এই প্রতিশ্রুতি তোমার পক্ষে